কাশ্মীর পরিক্রমা

• • • •

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

• • • •

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ

ভূমিকা

'কাশ্মীর পরিক্রমা' আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তক আকারে প্রকাশের সময় কিছু নূতন বিষয়বস্তু সংযোজিত হইল। কাশ্মীর পরিক্রমায় বাহির হইয়া যাহা দেখিয়াছি—পাকিস্তানী আক্রমণ কালে বিধ্বস্ত কাশ্মীরের অঞ্চলসমূহ, 'যুদ্ধ বিরতির' সুদীর্ঘ সীমা রেখা বরাবর ভারতীয় সৈন্যের অবস্থান এবং কাশ্মীরের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন প্রয়াস-প্রচেষ্টা,—এই গ্রন্থে শুধু তাহাই লিপিবদ্ধ হয় নাই। কাশ্মীরের সমস্যা বুঝিতে হইলে উহার অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যার স্বরূপও বুঝিতে হইবে; তাই, উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রন্থে আছে। কাশ্মীরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্রও গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। পুস্তকে প্রকাশিত বহু চিত্রই কাশ্মীর সরকার ও ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের সাহায্য ও সৌজন্যে লাভ করিয়াছি। গ্রন্থ প্রণয়নে সরকারী দলিল-পত্র এবং শ্রীকাউল ও শ্রীধরের মূল্যবান গ্রন্থ 'Kashmir Speaks' হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। ইহাদের সকলের নিকট-ই ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ইতি—

গ্রন্থকার

কাশ্মীর ভ্রমণের নিমন্ত্রণ। সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন কাশ্মীর—ভূস্বর্গ কাশ্মীর। এমন দেশ দেখিবার সাধ কাহার না হয়। স্বর্গে কেবল সৌন্দর্য নয়, ভোগ-সুখ-সমৃদ্ধিও নাকি অঢেল। নানা দেশ ও ধর্ম স্বর্গের বিচিত্র রূপ কল্পনা করিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য কাশ্মীর ভূস্বর্গ ঠিকই, কিন্তু ভরাপেট ভিন্ন সেই স্বর্গের সৌন্দর্য-শোভা কি উপভোগ করা সম্ভব? এই সত্য কথাটা ভুলিবার নহে:

'মনের বসন্তে যদি ফুল নাহি ফোটে,
বনের বসন্ত তবে মিথ্যা হয়ে ওঠে।'

তাই প্রশ্ন, বিদেশী পর্যটকগণ যে প্রাচুর্যসম্পন্ন হইয়া কাশ্মীর-সৌন্দর্য-শোভা ভোগ করে, কাশ্মীরের জনসাধারণ তাহা ভোগ করে কি না। কাশ্মীর-ইতিহাসে পড়িয়াছি, শুধু একবারের দুর্ভিক্ষে (দুর্ভিক্ষ বহুবার দেখা দিয়াছে) কাশ্মীরের অর্ধেক লোক মৃত্যুবরণ করে। কাশ্মীরের সৌন্দর্য-শোভা কিন্তু তখনো ছিল। কয়েক শত বৎসরের (প্রায় সাত শত) বিদেশী শাসন-শোষণে, একেবারে মধ্যযুগীয় বর্বর অত্যাচার ও লুণ্ঠনে কাশ্মীরের জনগণ নিষ্পেষিত হইয়াছে। ধর্মান্তরিত করিবার বর্বর প্রয়াসেরও অবধি ছিল না। হিন্দু আমলের পরেই কাশ্মীর কুশাসন ও শোষণের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়ায়। আজও মোগল আমলের বিলাস-ব্যসন ও সৌন্দর্য উপভোগের বহু শিল্প-নিদর্শন আছে কাশ্মীরে। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং ঔরঙ্গজেবেরও গ্রীষ্মকালটা কাশ্মীরে কাটাইবার বাদশাহী ব্যবস্থা ছিল। মোগল সম্রাটগণ দিল্লী বা লাহোর হইতে কাশ্মীর যাইতেন—সঙ্গে যাইত হারেম, আমীর-ওমরাহ, বিপুল সৈন্যসামন্ত; আর যাইত হস্তী, উট, ঘোড়া, খচ্চর, অসংখ্য তাঁবু, রসদাদি। ঔরঙ্গজেবের একবারের কাশ্মীর যাত্রার হিসাব হইতে জানা যায়—ত্রিশ সহস্র 'কুলী' বা মালবাহী প্রয়োজন হইয়াছিল কেবল স্থানে স্থানে মালপত্র নামাইতে, উঠাইতে। বাদশাহদের কাশ্মীর উপভোগের সেই

সমারোহে কাশ্মীরের জনসাধারণ (ইতিমধ্যেই অনেক হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াছে) ছিল শুধু ভারবাহী—ভোক্তা নয়। মোগলের পরে ব্রিটিশ আমলে—শিখ শাসনব্যবস্থায় এবং ডোগরা আমলেও জনগণের অন্তহীন দারিদ্র্য ঘোচে নাই। তাই সাংবাদিক হিসাবে জানিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা জাগে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের জনগণের আর্থিক অবস্থা কি ? অর্থাৎ বর্তমানেও তাহারা সেই সেকালের শিল্প-রচনার কার্যেই কুব্জদেহ ন্যুব্জপৃষ্ঠ হইয়া অন্নাভাবে ধুঁকিতেছে, না বর্তমানে তাহাদের পেটেও অন্ন পড়িয়া থাকে ? অন্নচিন্তায় বিপন্ন জনের নিকট ডাল হ্রদের চাঁদের আলোও অন্ধকার ছাড়া কিছু নহে। জানা আবশ্যক, আপন বাসভূমির সৌন্দর্য উপভোগের কিছুটা অবসর-সুযোগ পাইবার মত স্বাচ্ছন্দ্য তাহাদের আছে কিনা ; প্রকৃতি অজস্র ধারায় যে সুষমা ঢালিয়া দিয়াছে, তাহা তাহাদের জীবনে আনন্দ পরিবেষণ করিতেছে কিনা ; অন্তহীন দুঃখরজনীর অবসান ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে কি না। কাশ্মীর দেখিতে হইলে, তাহাও অবশ্যই দেখিতে হইবে।

ভারত সরকারের আমন্ত্রণে 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে-যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' কাশ্মীর দর্শনের জন্য দেহ-মনে যখন প্রস্তুত হইতেছিলাম, তখনই ভারত সরকারের প্রেস ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো হইতে শ্রীকমলকুমার (আমাদের প্রেস-পার্টির চার্জে ছিলেন) প্রেরিত জম্মু-কাশ্মীর টুর প্রোগ্রাম পাইলাম। এই টুর প্রোগ্রাম দেখার সঙ্গে সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর ভ্রমণে বাহির হইবার উৎসাহ শত গুণ বাড়িয়া গেল। পূর্বে যেখানে ছিল কিছুটা উৎসাহ, কিছুটা দ্বিধা, এখন সেখানে দেখা দিল নূতন উদ্যম। টুর প্রোগ্রামটি মোটামুটি এই : দিল্লী হইতে পাঠানকোট, পাঠানকোট হইতে মিলিটারী ব্যবস্থায় মিলিটারী আতিথ্যে জম্মু, উধমপুর, নওসেরা, ঝাঙ্গর, রাজৌরী, পুঞ্চ, ভিম্বারগলি, উরি, গুলমার্গ, বারমূলা প্রভৃতি ঘুরিবার ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানী হানাদারদের দ্বারা এই সকল অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়াছিল—এক সময় অধিকৃতও হইয়াছিল। ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী কর্তৃক পরে এই সকল অঞ্চল শত্রুকবলমুক্ত হইয়াছে। কাশ্মীর হামলা বা যুদ্ধকালে সংবাদপত্রে

উপরিউক্ত স্থানগুলির উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি। এই স্থানগুলি দেখিতে পারিলে যে বর্তমান সীজ ফায়ার লাইন তথা যুদ্ধ-বিরতি এলাকা দেখিবার সুযোগ পাইব : দেখিতে পাইব ইউ. এন.-এর অবজারভার দলকে—প্রোগ্রাম দেখিয়া ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আমাদের সৈন্য-বাহিনীর জোয়ানদের সীমান্তে অবস্থিত দেখিব, দেখিব তাহাদের সীমান্ত রক্ষার প্রস্তুতি, দেখিব তাহাদের প্রকৃত জীবন, তাহাদের জীবনযাত্রা—উৎসাহে বুক সত্যই ভরিয়া উঠিল। কিন্তু এই সীমান্তে অবস্থিত সৈন্যদের ঘাঁটিসমূহ দেখিতে হইলে যে ভয়াবহ কল্পনাতীত দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করিতে হইবে তাহা আমাদের মধ্যে কাহারো কল্পনায়ও আসে নাই।

তুষারধবল হিমালয়ের পাদদেশে জম্মু যেন শায়িত রহিয়াছে, অথবা অভ্রভেদী হিমগিরি এইখানে নামিয়া যেন শয্যা বিছাইয়াছে। ওখানকার পর্বতমালা সুউচ্চ নহে—১২ শত হইতে ২ হাজার ফুট উঁচুতে আরম্ভ। তারপর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়া—

ডাল হ্রদে পদ্ম-শোভা

৭।৮।৯ হাজার হইতে ১৩।১৪ হাজার ফুট উঠিয়া ক্রমে (ইহাই হিমালয়ের শৃঙ্গ) অভ্রভেদী মহিমায় উঠিয়া গিয়াছে। পীরপাঞ্জাল পর্বত ঘেরা এই সুন্দর জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকা। এখন আমাদের গন্তব্য পথের দুর্গমতার কথায় বলি : এই পার্বত্য পথ ২ হাজার ফুট

হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথাও ৯ হাজার ফুট উপরে উঠিয়াছে। কখনো মনে হয়—গোটা পর্বতটাই ঘুরিয়া গেল বুঝি; আঁকিয়া বাঁকিয়া কোথাও ঘুরিয়া ফিরিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে কত ঝরনার ধারা, নদীর সেতু। কোথাও রাস্তা বলিতে শুধু আস্ত প্রস্তররাশি—উঁচু-নিচু ঢালু। মিলিটারী কর্তৃপক্ষ বলিলেন, পার্বত্য এই রাস্তা সমতল অবশ্যই নয়, দুর্গমই বটে; তবে সম্প্রতি প্রবল বর্ষণ হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই রাস্তা অধিক দুর্গম হইয়াছে; পূর্বে এতটা দুর্গম ছিল না! ঝাঙ্গরের একটি মিলিটারী কোয়ার্টার হইতে যুদ্ধবিরতি-রেখার প্রথম পিকেট-পোস্ট তিন মাইল। এই তিন মাইল মাত্র রাস্তা যাইতে শক্তিশালী মিলিটারী জীপের প্রায় ১ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইল। উঁচু, নিচু, ঢালু, উৎরাই পাথর ঠেলিয়া যাওয়া জীপ গাড়ীর পক্ষেও কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার ইহা হইতেও কিছুটা ধারণা হইবে।

কঠিন রুক্ষ পর্বতমালা—বৃক্ষলতার চিহ্নমাত্র নাই।

কাশ্মীরের নদ-নদী, হ্রদ-প্রস্রবণ, শস্যশ্যামল প্রান্তর; পপলার, চীনার, চীর, পাইন, দেবদারু বৃক্ষরাজি, ফুল-ফলের অপরূপ শোভা—ফুলবন—গোটা প্রকৃতিই কমনীয় রমণীয় সুষমামণ্ডিত। ঐ সৌন্দর্যশোভা শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিবার,—বিশ্লেষণ করিবার নয়। কিন্তু

বিস্ময় এই, কোমল-কমনীয় সৌন্দর্যের পাশেই ধূসর কঠিন অতি নিষ্করুণ পৌরুষের দৃপ্ত ও উদ্ধত ভঙ্গিমায় আকাশে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়াছে পর্বতমালা—কোথাও বৃক্ষলতার চিহ্নমাত্র নাই। আবার এই কাশ্মীরেই পর্বতমালার সে-কি শ্যামল শোভা ; এমন দেবদারু-বৃক্ষশোভা হিমালয়েরও অন্যত্র বিরল। কোমল-কাঠিন্যের এই মিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়াই কাশ্মীর এত সুন্দর। এইখানেই বলিয়া রাখি, কাশ্মীর তিব্বতেরও আরও উর্ধ্বে উত্তরে অবস্থিত। বিস্ময় লাগে—এমন স্থানেও জলেভরা অঞ্চল আর নৌকায় নৌকায় জলে বাস সম্ভব। ভূপ্রকৃতির কত বিপর্যয়ে ও বিবর্তনে কত অঘটনই না ঘটিয়া গিয়াছে। ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও শুনিয়াছি---কিংবদন্তীও শুনিয়াছি।

ইউ. এন. অবজারভার দলের কোন কোন অফিসারের (এই দলে এখন মার্কিন নাই ; অস্ট্রেলিয়ান-সুইডিশ রহিয়াছে) সঙ্গে এই দুর্গম রাস্তায় কখনো কখনো দেখা হইয়াছে। পুঞ্চ যাওয়ার পথ অতিশয় দুর্গম। এক স্থানে প্রায় পোয়াটাক মাইল শুধুই বড় ছোট মাঝারী পাথর ; উঁচু, নীচু, চড়াই-উৎরাই ভাঙিয়া জীপও যেন আর আগাইতে পারে না। এই অবস্থায় পথে দেখিলাম ইউ. এন.-এর জীপে এক সাহেব. গাড়ী আর তাঁহার অগ্রসর হইতে চায় না। আমাদের দুর্গতি দেখিয়া সাহেব হাসেন, সাহেবের দুরবস্থা দেখিয়া আমরাও হাসি।

সীজ-ফায়ার লাইন দেখার বাসনা ছিল। সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। এস্থলে আমাদের সৈন্যবাহিনী এবং সৈন্যদের অবস্থান সম্বন্ধে কিছু বলিব। বলা বাহুল্য, সামরিক নিরাপত্তার দিক হইতে কতক তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

জম্মু হইতে (১০৷৯৷৫৬) উধমপুর রওনা হইলাম। সেখানে রাত্রিতে বিশিষ্ট সামরিক অফিসারগণের সঙ্গে বাহিনীর জোয়ানদের বসবাস, শিক্ষা-ব্যবস্থা, ছুটির ব্যবস্থা, বেতন-ভাতা, 'রেশান' ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা হয়। এই দুর্গম স্থানে তাহাদের

আনন্দ বিধানের জন্য কি কি করা হয়, আর কি করা যায় তাহারও আলোচনা হইল। এই সম্পর্কে আমাদের ২।১টি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন—বাহিনীর প্রধান নেতা আমাদের বলিলেন। কোথায় কোথায় আমরা যাইব, কি ভাবে যাওয়া সম্ভব, তাহাও অনেকটা জানা গেল।

উধমপুর হইতে উরি পর্যন্ত সীমান্ত বরাবর কতকগুলি সামরিক ঘাঁটি দেখিয়াছি। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে যে-সকল সামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সংস্রবে আসিয়াছি, তাঁহাদের বীরত্বের, নৈপুণ্যের, নেতৃত্বের গৌরব আছে, ঐতিহ্য আছে। মেজর-জেনারেল জে. এন. চৌধুরী, জেনারেল বিক্রমদেব সিং গিল, জেনারেল বিক্রম সিং, নরেন্দ্র সিং, জেনারেল থাপার (ইনি দুই বৎসর পাকিস্তানে যুদ্ধবন্দী ছিলেন) প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি।

এই সমস্ত নেতৃস্থানীয় সামরিক ব্যক্তিগণ শুধু আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও ব্যবহারেই শান্ত-সংযত ও ভদ্র চরিত্রের পরিচয় দেন নাই, ইহাদের সহকর্মিগণের সঙ্গে তাঁহাদের বন্ধুবৎ প্রীতিপূর্ণ অথচ সংযত আচরণ লক্ষ্য করিবার মত। নেতৃস্থানীয়গণের সকলের মুখেই সাধারণ সৈন্যবাহিনীর অর্থাৎ জোয়ানগণের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহাদের কথা ঃ 'You see, they are the real army, real army life ওদেরই। আমাদের দেখে real armyর পরিচয় পাবেন না।' চৌধুরী বাঙালী ; আমার অর্থাৎ আনন্দবাজারের পরিচয় জানিয়াই বলিলেন, "আপনি ওদের সঙ্গে, জোয়ানদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলবেন।" জনকয় বাঙালী অফিসারকে দেখাইয়া বলেন, এরা বাঙালী। জোয়ানদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক বাঙালী আছে। তেমনি আছে অন্ধ্র, তামিল, হায়দরাবাদী, আসামী, বিহারী, গুজরাতী, মারাঠী, উত্তর প্রদেশবাসী। আমাদের প্রেস-পার্টিতে এই সকল বিভিন্ন প্রদেশের লোক ছিলেন। সুতরাং দূর দুর্গম অঞ্চলে জোয়ানরা তাহাদের মাতৃভাষা শুনিতে পাইলে বিশেষ খুশী হইবে ; তাই শ্রীচৌধুরী ওভাবে

কথাটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। একজন শিখ অফিসার বলিলেন, "আমি বাংলা শিখছি। আমাদের উপর বাংলা ভাষা শিখবার, শুধু বাংলা কেন, ভারতের কয়েকটি ভাষা শিখবার নির্দেশ আছে।" একজন শিখ অফিসার বলিলেন, "আমি সুরাবদীর মিনিস্ট্রির সময় অর্থাৎ গ্রেট কিলিং-এর সময় কলকাতায় ছিলাম"। বারাকপুর হইতে তিনি কলিকাতায় আসেন। বলিলেন, "আশ্চর্য, আপনাদের আনন্দবাজার রায়টের সময় আক্রান্ত হয়েছিল!" এছাড়া কলিকাতার রায়ট সম্পর্কে আরও অনেক কথাই বলিলেন।

কাশ্মীরের সম্পদের সংবাদ আকৃষ্ট করিয়াছে বহু লুব্ধ বিদেশী রাজশক্তিকে। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান তেমনি লুব্ধ হইয়া উঠে। কাশ্মীর আক্রমণ করিলেই উহা হস্তগত হইয়া যাইবে, পাকিস্তানের প্রধান নায়ক জনাব জিন্না মোগলবাদশাহী গৌরবে কাশ্মীরে প্রবেশ করিবেন, দরবার বসাইবেন, এমন আশায় লাহোর হইতে রাওয়ালপিণ্ডি গিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। পাকিস্তানী সৈন্য সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হইয়াই সহসা অভিযান চালাইল। আশেপাশের উপজাতীয় বর্বর ও জাতলুঠেরাদের পাকিস্তান সঙ্গে ডাকিয়া লইল। লুণ্ঠনের আশায় তাহারাও সঙ্গী হইল। বেশ কল্পনানুযায়ী বিভিন্ন দিক হইতে কাশ্মীর আক্রান্ত হইল। কাশ্মীরের এমন কোন সৈন্যবলই ছিল না যাহার সাহায্যে ব্রিটিশ-শক্তির অবসানে আক্রান্ত হইলে উহা আত্মরক্ষা করিতে পারে। কাশ্মীর মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র। কিন্তু কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্সের মুসলমান নেতৃবর্গই পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে বদ্ধপরিকর হইলেন, জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু না আছে ইহাদের অস্ত্রবল, না আছে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা। আক্রান্ত কাশ্মীর (হানাদার বাহিনী তখন শ্রীনগরের নিকটবর্তী) তখন স্বেচ্ছায় বিধিমতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইল।

অতঃপর জম্মু ও কাশ্মীর রক্ষা তথা ভারতের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় অগ্রসর হইল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। কিন্তু ভারত তথা ভারতীয় সৈন্যগণ আদৌ প্রস্তুত নহে। ব্রিটিশের প্রভুত্ব ত্যাগ করার

সঙ্গে সঙ্গেই ভারতকে তাহার সীমান্ত রক্ষার্থ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে, তাহাও পাকিস্তানের সঙ্গে, ইহা ভারত কল্পনাও করে নাই। সে-কারণে "কাশ্মীর যুদ্ধের" জন্য ভারতের সৈন্যবাহিনী মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এই একান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায়ই কাশ্মীর রক্ষার্থে ভারতীয় সৈন্যদলকে ছুটিতে হইল। পাকিস্তানী হানাদারগণ তখন পরিকল্পনানুযায়ী বিভিন্ন দিক হইতে চলিয়াছে শ্রীনগরের দিকে। পথে পথে চলিয়াছে লুণ্ঠন, গৃহদাহ, অত্যাচার, হত্যা, নারীর লাঞ্ছনা।

বারমূলার পথ ধরিয়া পাকিস্তানী সৈন্যের এক বাহিনী শ্রীনগরের মাত্রই ১২।১৪ মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর আসিয়া পৌঁছিতে আর তিন ঘণ্টা বিলম্ব হইলে সোনার শ্রীনগরও বর্বর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতে বাকি থাকিত না।

পূর্বেই বলিয়াছি, জম্মু ও কাশ্মীরের এই সকল অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য ভারতীয় সৈন্যগণ প্রস্তুত ছিল না। প্রাথমিক এই অবস্থায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে নানা বাধাবিঘ্ন ও অপরিচয়ের অসুবিধার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। সেনানায়কগণকে ভারতের মর্যাদা রক্ষার মৃত্যুজয়ী সংকল্প লইয়া জীবন তুচ্ছ করিয়া দুর্জয় সাহসে শত্রুগণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাই দেখা যায়, প্রথম অবস্থায় সাধারণ সৈন্যগণকে উৎসাহে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে, তাহাদের সম্মুখে ভারতের মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবনোৎসর্গের আদর্শ স্থাপন করিতে অনেক বিশিষ্ট সামরিক নায়ককে প্রাণ দিতে হইয়াছে। আদর্শের জন্য এই প্রাণ দেওয়ার দুর্জয় সঙ্কল্পই অতি অল্প কালের মধ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। প্রভুত্ব ত্যাগের সময় এবং পরেও ইংরেজ সেনানায়কগণ কোন সামরিক তথ্যাদি দিয়া সাহায্য করে নাই বরং অসুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছে। যাহাই হউক, ক্রমে রাস্তাঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি সম্পর্কেও জ্ঞান সঞ্চিত হইল। উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, যানবাহন, যোগাযোগ প্রভৃতির নিপুণ বিধিব্যবস্থা হইল। ভারতীয় বিমানবহরের সর্ববিধ সাহায্য ও তৎপরতা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া দিল। শত্রুগণ অধিকৃত স্থান হইতে বিতাড়িত হইতে লাগিল। পার্বত্য যুদ্ধের দুরূহতা

আছে (প্রথম অবস্থায় মিলিটারী ট্রাক যাইবারও পথ সর্বত্র ছিল না) বহু রাস্তাই ছিল সংকীর্ণ ও দুর্গম। তাহার উপর শীতে তুষারপাত আছে —ভারতীয় সৈন্য সকল পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হইল। ভীষণ তুষারপাতের মধ্যেও ভারতীয় সৈন্যগণ যেভাবে সংগ্রাম করিয়াছে, যে-ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, পাকিস্তানী হানাদার সৈন্য তাহা সহ্য করিতে পারে নাই। এই কথা একজন সেনানায়ক বিশেষ গর্বের সহিত বলিলেন। ইহার কারণ, ভারতীয় সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়াছে কাশ্মীর রক্ষার জন্য, দেশের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য। পাকিস্তানী সৈন্যের সেই মনোবল থাকিবার কথা নহে। তাহারা জানে তাহারা আক্রমণকারী, লুণ্ঠন ও শত অত্যাচার এই আক্রমণের সঙ্গে জড়িত। পাকিস্তানী মুসলমান সৈন্যই দেখিয়াছে, তাহাদের দ্বারা শুধু হিন্দু নয় মুসলমান নরনারীও অত্যাচারিত হইয়াছে। লুণ্ঠন, স্বার্থসিদ্ধি, ব্যক্তিগত লাভ ও ভোগের জন্যই তাহাদের আসা। সুতরাং তুষারপাতের মধ্যে তাহারা তিষ্ঠিতে পারিবে কেন? তাহারা যেখানে ঘাঁটি ত্যাগ করিয়া সহজে পলাইয়াছে, ভারতীয় সৈন্যগণ সেখানে তুষারপাতের মধ্যে আগাইয়া সীজ-ফায়ার লাইনে গিয়াছে ও ঘাঁটি আগলাইয়াছে।

উধমপুরে সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছুটা ধারণা হয়। অতঃপর জম্মু হইতে আমরা নওসেরা যাই। এই নওসেরা শহরটি আক্রান্ত হয়, অধিকৃত হয়। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী আসিয়া পাকিস্তানী সৈন্যদের হটাইয়া দেয়। কোন্ পর্বতশৃঙ্গের উপরে সংগ্রাম চলে তাহাও দেখিলাম। শত্রু কোন্ পথে হতাহত পশ্চাতে ফেলিয়া পলায়, তাহাও দেখি। পাকিস্তানীদের ঘাঁটি হইতে তাড়াইয়াই সেই ঘাঁটি ভারতীয় বাহিনী পাকা করিয়া লইয়াছে, সংযোগ স্থাপন করিয়া লইয়াছে এবং সংযোগ স্থাপন করিয়া পরবর্তী লক্ষ্যস্থলে অগ্রসর হইয়াছে। এই নওসেরা শহরের অধিবাসীদের আক্রমণকালীন অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। তাহারা দূর দূরান্তরে পলায়ন করিয়াছে। শহরে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। বর্তমানে এখানে অধিবাসীরা যে পরম নিশ্চিন্তে রহিয়াছে, আক্রমণের ভয় যে তাহাদের আর নাই, কয়েকজনের সঙ্গে

আলাপ করিয়া তাহাই বুঝিলাম। ছেলেরা বই বগলে স্কুলে যায়। এক জায়গায় দেখিলাম, ৮।১০টি ছেলে এক স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি বই পড়? একজন অনেকটা গর্বভরেই যেন বলিল,—ইংরেজী, উর্দু, সংস্কৃত। পরে জানিলাম—ব্রাহ্মণ হিন্দুদের সংস্কৃত পড়িবার ব্যবস্থা আছে। কাশ্মীরের পণ্ডিতরা তো সংস্কৃত পড়েই।

সদ্য শত্রুকবলমুক্ত নওসেরা ঘাঁটি ভারতীয় সৈন্যগণ সুরক্ষিত করিয়া লইতেছেন

নওসেরায় সৈন্যবাহিনীর নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গেই শুধু আলাপ-পরিচয় করিয়া সাধারণ সৈন্য জোয়ানদের সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়াছি তাহা নহে, জোয়ানদের ক্যাম্পে ক্যাম্পেও তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যাপার দেখিয়াছি। স্বাস্থ্য ও উৎসাহ জোয়ানদের চরিত্রের ভিত্তি। নেতাগণ এই ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে যত্নশীল।

নওসেরায় নৈশভোজনে দুইজন ইউ. এন.-এর অবজারভার (অফিসার) আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন—অস্ট্রেলিয়ান। সাধারণভাবে আলাপ হইল, অর্থাৎ কতদিন এখানে আছেন; কেমন লাগছে এ-দেশ এ-কাজ, ইত্যাদি কথা মাত্র। ওঁরা একটা নিরপেক্ষতার ভাব বজায় রাখেন—অন্তত প্রকাশ্য আচরণে তাহাই রাখিবার চেষ্টা করেন। উচ্চ সামরিক কর্মচারীকে ইহাদের আচরণ ও মতিগতি সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে বলেন, "এঁরা মোটামুটি ভালই, কোন পক্ষপাতিত্ব ওঁদের আচরণে দেখি না। ন্যস্ত দায়িত্ব ওঁরা নিরপেক্ষতার সঙ্গেই পালন করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং কোন বিরুদ্ধ মনোভাব আমরা পোষণ করি না; মনে হয় ওঁরাও (আমাদের সম্পর্কে) করেন না।"

নওসেরা হইতে আমরা সদলবলে ঝাঙ্গরের দিকে রওনা হইলাম

১৯৪৮ সালে যুদ্ধ চলার সময় নওসেরার সংকীর্ণ উপত্যকাপথে রসদ সরবরাহের দৃশ্য

১২।৯।৫৬ তারিখের ভোরেই। রাস্তায় এক মিলিটারী পোস্টে আমরা নামিলাম। উদ্দেশ্য, সুউচ্চ পাহাড়ের উপর আমাদের জোয়ানরা

যেখানে ক্যাম্যুফ্লেজের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া পাকিস্তান-সীমান্ত বরাবর সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখিতেছে, তাহা দেখা। একেবারে খাড়া পাহাড়। জোয়ানদের জন্য রসদাদি পৌঁছাইবার দুষ্কর কার্য 'পনি'র দ্বারাও সম্পন্ন হইবার উপায় নাই। মানুষই তাহা বহন করিয়া লইয়া যায়—মায় পানীয় জল পর্যন্ত। সৈন্যদের সেই ঘাঁটিতে পৌঁছিতে এক ঘণ্টা পাহাড় ভাঙিতে হয়। আমাদের পার্টির কয়েকজন উঠিয়া গেলেন। চারিদিকে পরিস্থিতি দেখিয়া পুনরায় প্রায় এক ঘণ্টায় নামিয়া আসিলেন। থাকিয়া গেলেন গবর্ণমেণ্টের কৃতী আর্টিস্ট জ্যোতি ভট্টাচার্য। বাঙ্গালী যুবক। তিনি জোয়ানদের বিবিধ স্কেচ্ আঁকিলেন। একেবারে জীবন্ত নওজোয়ান যেন আসমান ছুঁইয়া ভারতরক্ষায় জান কবুল করিয়া বুক ফুলাইয়া বন্দুক হস্তে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পর্বতচূড়ায় তাহাদের আস্তানা প্রভৃতি আঁকিলেন। এবার নামিবার পালা। দুইজন জোয়ান নিচুতে নামিবে। তাহারা জানাইল, একটা সোজা রাস্তা আছে, অবশ্য বেশী রকমের খাড়া, নিচু ঘাঁটিতে নামিতে এক ঘণ্টার অনেক কম সময় লাগিবে। বোধ হয় সহসাই আমাদের শিল্পীর মধ্যে তরুণ বাঙালী জাগিয়া উঠিল। বাঙালী কিসে কম? ঐ জোয়ানদের সঙ্গে পাল্লা দিয়াই তিনি তীরবেগে উঁচু পাহাড় হইতে খাড়া নীচে নামিয়া আসিলেন। অবশ্য দেখা গেল সিভিল জুতাজোড়ার সোলটা একেবারে খুলিয়া গিয়াছে। বলিলেন, একপ্রকার প্রাণ তুচ্ছ করিয়াই জোয়ানদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া নামিলাম।

ঝাঙ্গর

এই সেই ঝাঙ্গর। এইখানেই ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ ওসমান (17 Dogra Regiment-এর অধ্যক্ষ ছিলেন) শত্রুর নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। এই স্থানে একটি সরকারী পাকা বাড়ী পূর্ব হইতেই ছিল। অদূরে পাহাড় হইতে শত্রুগণ আক্রমণ চালায়। আরম্ভ হয় ঘোরতর যুদ্ধ। বিগ্রেডিয়ার ওসমান

সৈন্যগণকে উৎসাহ যোগাইতেছিলেন। শত্রুর উঁচু ঘাঁটি আক্রমণ করিতে প্রেরণা দিতেছিলেন। অকস্মাৎ শত্রুর একটা গোলা আসিয়া পড়ে। ঝাঙ্গরের এই যুদ্ধ হয় ১৯৪৮ সনে। এইখানে ২৬৮জন ভারতীয় সৈনিক প্রাণ হারায়। কিন্তু তাহাদের প্রাণদানের ও বীরত্বের ফলে অদূরের পর্বত-ঘাঁটি হইতে পাকিস্তানী সৈন্যদলকে

ব্রিগেডিয়ার ওসমানের সমাধি—ঝাঙ্গর ঃ
জেনারেল শ্রীনাগেশ মাল্যদান করিতেছেন

পলায়ন করিতে হয়। হতাহতের সংখ্যা পাকিস্তানের দিকেও কম হয় নাই। এই পাকাবাড়ীতে বর্তমানে মিলিটারীর একটি কোয়ার্টার। এই বাড়ীর ২০ ৩০ হাত দূরে যেখানে ব্রিগেডিয়ার ওসমানের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়, সেখানে একটি বেদী ও স্মৃতিফলক নির্মিত হইয়াছে।

আমরা বীর ওসমানের সমাধি-বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করিলাম। বীর সৈনিকগণের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধায় মস্তক নত করিলাম।

এখান হইতে যেখানে সীজ-ফায়ার লাইনে আমাদের সৈন্যগণের (পিকেটদের) ঘাঁটি, সেখানে, মাত্র তিন মাইল দূর, গেলাম। মাত্র তিন মাইল যাইতে জীপের প্রায় ১ ঘণ্টা লাগিল। পার্বত্য রাস্তা এমনই দুর্গম। জীপ হইতে নামিয়া কিছুটা পদব্রজে আগাইতে হইল। সেখানে দেখিলাম উঁচু টিলায় (দূর হইতে ঘরগুলি দেখা যায় না—ঘর বলিয়া বুঝা যায় না) থাকা-খাওয়া ও রান্নার ঘর। সেখানে হায়দরাবাদ, কোচিন-ত্রিবাঙ্কুরের জোয়ান সব আছেন। সেখান হইতে হাঁটিয়া গোটাকয় ক্ষুদ্র ঝরনা-প্রবাহ পার হইয়া আসল সীজ-ফায়ার লাইনে, যেখানে আমাদের পিকেটরা পাকিস্তানী ঘাঁটির মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে, একেবারে সেইখানে গেলাম। ঝাঙ্গরের অফিসারের নির্দেশে আমরা মাত্র তিন জন করিয়া টিলার উপর পিকেটদের নিকট গেলাম। অনুমান একুশ গজ দূরে পাকিস্তানী পিকেটও দেখা গেল। ঝাঙ্গরের এই সীজ-ফায়ার লাইনের ওপারে কিছু বসতিও দেখা গেল, কিছু চাষবাসের নমুনা। আমাদের দেখিয়াই পাকিস্তানী পিকেট একটা গৃহে ছুটিয়া গেল। মনে হইল সংবাদ দিতে। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া সঙ্গীন তুলিয়া দাঁড়াইল। দূরে একটা বসত-বাড়ীও দেখা গেল। ভারতীয় পিকেটদের পর্যবেক্ষণের স্থান হইতে মূল ঘাঁটি পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। অল্প দূরে দূরে টিনের কৌটা ঝুলানো। আশঙ্কামূলক কোন সংবাদ মূল ঘাঁটিতে পাঠাইতে হইলে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা টুন টুন করিয়া বাজিয়া একেবারে মূল কেন্দ্রকে সজাগ করিয়া দেয়। ঝাঙ্গরের এই দক্ষিণী পিকেটদের সঙ্গেও আমরা চা পান করিলাম। কী আগ্রহে যে তাহারা আমাদের নানা প্রকারের ভাজাভাজি দিয়া আপ্যায়িত করিল তাহা বলিবার নহে! ভারতের সংবাদপত্র তাহাদের সংবাদ লইতে আসিয়াছে, এই সাংবাদিক দলে তাহাদের অঞ্চলের মানুষও আছে, এ যেন কত আনন্দের! ঝাঙ্গরের এই মিলিটারী ক্যাম্পে আমরা ৩টায় লাঞ্চ খাইলাম। ৫টায় কালসিন বড় ঘাঁটিতে গেলাম। সেখানে জোয়ানদের

খেলাধূলা ও পড়াশোনার ব্যবস্থা দেখিলাম, কুস্তিও দেখিলাম। কালসিনে একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির দেখিলাম। ঝরনা, ঝরনার জলধারা, চমৎকার কুণ্ডটি ঃ তাহারই পাশে ক্যাম্পে চা-সিঙ্গাড়া ইত্যাদি বিবিধ ভাজি ও পানতুয়া, সঙ্গে চা। চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের সম্পর্কে নানা বিষয় পরিজ্ঞাত হইলাম। স্থানটি স্নিগ্ধ মনোরম। এখানে জেনারেলের স্কেচ্ নিলেন আমাদের শিল্পী ভট্টাচার্য। জেনারেল স্কেচখানা দেখিয়া খুশী হইলেন খুব।

ঝামেলা

ঝাঙ্গর যাওয়ার পথে একটা ব্যাপার ঘটিল। নদীর উপর সেতু (স্থানের নাম উল্লেখ করিলাম না)। বেশ বড় সেতু। নদীর পাড়ে পাড়ে উঁচু পাহাড়। ওয়ান-ওয়ে রোড। চেক্ পোস্ট। আমাদের জীপগুলি সব থামিয়াছে। আমাদের সঙ্গে জন-কয়েকেরই ক্যামেরা ছিল। দুইজন নামিয়াই নদী, সেতু ও পাহাড়ের দৃশ্যের ফটো লইলেন। স্থানটি অর্থাৎ সেতু সামরিক দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের সীমা মাত্র অদূরে। এই সেতু ও সেতুরক্ষার ব্যবস্থা মিলিটারী 'সিক্রেটের' অন্তর্গত। প্রহরারত সৈনিকরা লক্ষ্য করিয়াছে। ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে অফিসারের (অদূরেই কোয়ার্টার) কানে গেল। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রিত প্রেস-পার্টি, অফিসার জানেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের নিকট ফোন করিয়া দিলেন। সুতরাং অবস্থা দাঁড়াইল এই যে, ব্রিগেডিয়ারের নিকট হইতে অনুমতি না আসিলে প্রেস-পার্টির অগ্রসর হওয়াও বন্ধ। আমাদের সঙ্গে ভারত সরকারের পাবলিক রিলেশান অফিসার (In-charge) ছিলেন, ছিলেন মিলিটারী অফিসার স্কোয়াড্রন লীডার (S/LDR Mullick —P. R. O./IAF.) মল্লিক এই স্থানেই অফিসারকে গিয়া বলিলেন ঃ এই Press Partyর ঝাঙ্গর পৌঁছিতে হইবে, ওখানে সেনানায়কগণ অপেক্ষা করিতেছেন, ক্যামেরা হইতে ফিল্ম খুলিয়া রাখিতেছি ঃ ইহারা জানিতেন না। তা ছাড়া I take responsibility as an officer.

কিন্তু অফিসারটি বলেন ঃ আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের নিকট বিষয়টা জানাইয়া ফেলিয়াছি ; সুতরাং তাঁহার অনুমতি ভিন্ন আমি কি করিতে পারি ? অনুমতির জন্য আবার ফোন করা হইল……কেন্দ্রে। তিনি অন্যত্র কাজে আটকা। এইভাবে দেড় ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। অবশেষে আবার ফোনে চেষ্টা করিয়া 2nd officer-in-commandকে মিঃ মল্লিক ধরিলেন। ক্যামেরা হইতে ফিল্ম খুলিয়া রাখিয়া স্থানীয় অফিসারকে উহা লিখিতভাবে দিয়া আমরা যাত্রার অনুমতি পাইলাম। মিঃ মল্লিক ফোনে এ-কথাও বলিতেছিলেন, একটা তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া Press Partyকে—all of them are very responsible persons—এতক্ষণ যাইতে না দেওয়া অন্যায় হইতেছে। স্থানীয় অফিসারটি পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি জানি যে, তুচ্ছ ব্যাপার ; ফিল্মটা আপনারাই নষ্ট করিতে পারিবেন ; তবু আমি জানাইয়া ফেলিয়াছি যখন, তখন অনুমতি না আসিলে আমার করার কিছুই নাই। এই স্থানে প্রহরারত একটি সৈনিক আমাদের নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিতেছিলেন, "হামলোক জান দেনেকে লিয়ে তৈয়ার হ্যায়,—লেকিন জুতি খানেকে লিয়ে তৈয়ার নেহি হ্যায়"। সেতু পাহারায় সৈনিকদের এই দুঃখের হেতু ঃ কেস্ যখন হইয়াছে, তখন প্রশ্ন হইবে, তোমরা ডিউটিতে থাকিতে কেমন করিয়া ক্যামেরা ব্যবহৃত হইল, কি তোমার কৈফিয়ৎ ? আমাদের জীপের ড্রাইভার ক্যামেরা হাতে দুইজনকে অপর জীপ হইতে নামিতে দেখিয়াই কয়টা সেতুর নামোল্লেখ করিয়া (এখানে নামোল্লেখ করিব না) বলিয়াছিল, যে ফটো নিতে মানা। আমাদের মধ্যেকার দুইজন না জানিয়া ফটো একটা নিয়া ফেলেন। প্রহরী, ৫।৬ খানা জীপ পর পর ছিল, প্রথম লক্ষ্য করে নাই। ক্লিক শব্দ হইতেই একজন লক্ষ্য করে। সৈনিকটির কথায় বুঝিলাম কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, এমন ব্যাপার লইয়া কৈফিয়তের সম্মুখীন হইতেই যেন তাহাদের মাথাকাটা যায়—জোয়ানের এই মর্যাদাবোধ দেখিয়া খুশী না হইয়া পারি নাই। সৈনিকটিকে আমি বলিলাম, ৪।৫টা জীপ গাড়ী ছিল, অপর ২।৩খানা বাসও ছিল, তাই

ব্যাপারটা আপনারা দেখেন নাই, এ-কথা বলিবেন। আমরা ত ফিল্ম রাখিয়াই গেলাম ; কিন্তু সৈনিক—কথা স্বতন্ত্র। প্রতিকার হইবে, কোন ক্ষতিও হইবে না, সেনানায়কও তাহা জানেন, তবু প্রশ্ন করিতে পারেন, তোমরা দেখিলে না কেন, ব্যাপার ঘটিতে পারিল কেন ?··· আমাদের অর্থাৎ শিথিল স্বভাবের যারা আমাদের মত, এই ব্যাপারে কিছুটা শিক্ষা হইল। ডিসিপ্লিনের কড়াক্রান্তি হিসাব চাই।

রাজৌরী

ঝাঙ্গর হইতে নৌসেরায় ফিরিয়া (১৩।৯।৫৬) আমরা ভোরেই রাজৌরী রওনা হই। পথে ট্রানজিট ক্যাম্প এবং বড় সাপ্লাই বেস্ দেখিলাম। পথে দেখিলাম পুরাতন ফোর্ট। স্থানীয় লোক বলে চেঙ্গিস খাঁর ফোর্ট। ইহা সত্য কিনা জানি না। রাজৌরী হইতে ১৬ মাইল দূরে আমরা নামিলাম। ওখানে বাদশা জাহাঙ্গীরের সমাধি। ইতিহাস বা কাহিনী এইরূপ ঃ—জাহাঙ্গীর বাদশা কাশ্মীর হইতে লাহোরে ফিরিবার পথেই মারা যান। বেগম নূরজাহান সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদটি তখনও প্রচার করিতে চাহেন নাই, দিল্লী-লাহোরে বিদ্রোহ বা সিংহাসন লইয়া গোলযোগ বাধিবে বলিয়া। এই স্থানে সম্রাটের দেহ রাস্তার (মোগল রোড) কিঞ্চিৎ দূরে লইয়া যাওয়া হয়। নূরজাহানের নির্দেশে চিকিৎসক সম্রাটের পেট চিরিয়া পাকস্থলী, অন্ত্রাদি বাহির করিয়া ফেলিয়া আরকাদি দিয়া বাঁধিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া (এমনভাবে ব্যাণ্ডেজ করা হইল যেন হস্তীর উপর হাওদায় বসাইয়া রাখা সম্ভব হয়) রাখিলেন। লাহোরে প্রবেশ করার কালে রাজকীয় পোষাক পরাইয়া হাওদায় বসাইয়া সম্রাটের মৃতদেহকেই সম্রাট বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইল। সম্রাটের পাকস্থলী, অন্ত্রাদি যেখানটায় ছিল সেখানে একটি সমাধি রচিত হয়। বর্তমানে উহা অবজ্ঞাত অবস্থায়। এক আধটা ভেড়া ও গরু বিশ্রাম করিতেছে দেখা গেল। আসলে জাহাঙ্গীর বিম্বরগলিতেই মারা যান।

কিছুটা দূরে একটা স্থান, লোকে বলে, 'নূর চিনি'। নূরজাহান এখানে স্নান করিতেন। একটা ঘর দেখাইয়া বলে, এখানে স্নানের
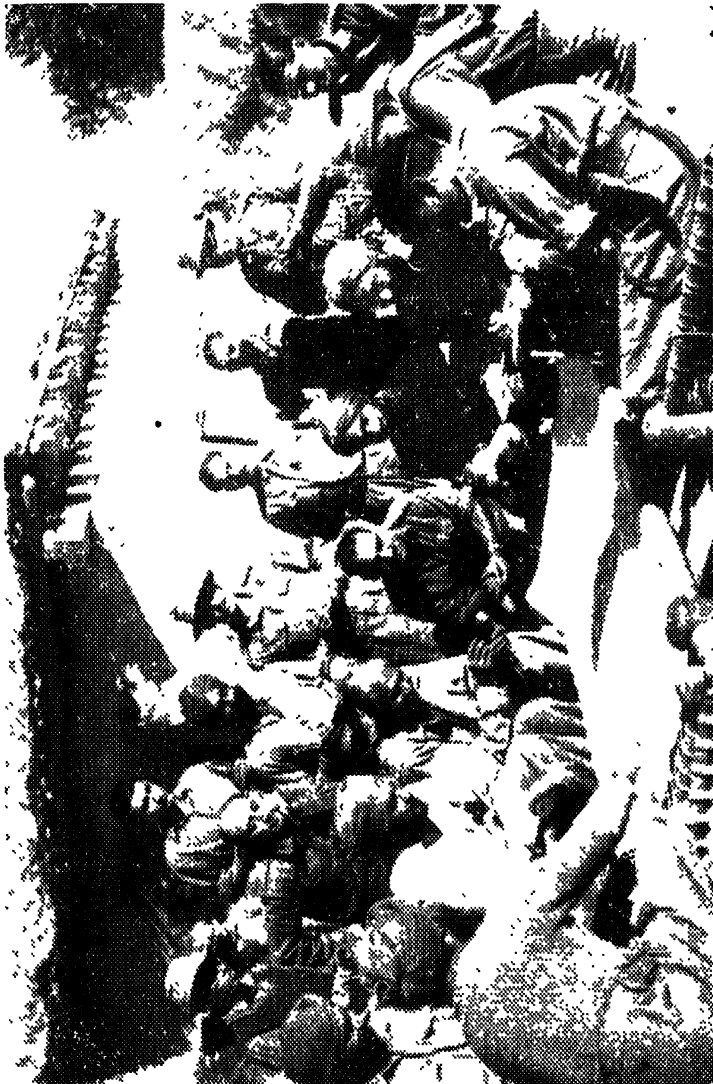
রাজৌরী অঞ্চলে যুদ্ধকালে ভারতীয় সেনানায়কদের আলোচনা

ব্যবস্থা ছিল—এখনও নাকি আরশি-চিরুণি আছে। আরশি-চিরুণির গল্প বিশ্বাস হয় না। তবে মোগল বাদশাহদের স্থানে স্থানে ছাউনি

পড়িত। গোসলখানা ছিল। জাহাঙ্গীর বেগমদের লইয়া কমপক্ষে ৮ বার কাশ্মীরে আসিয়াছেন। সুতরাং নির্দিষ্ট পথে পাকা গোসলখানা নির্মাণ অসম্ভব কিছু নহে।

রাজৌরী গেলাম। ঐ কেন্দ্রের জেনারেল আমাদের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন। ওখানে জলযোগের প্রচুর আয়োজন ছিল। সুদৃশ্য লনে স্থান করা হইয়াছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্যও ওখানে সুন্দর; লনটিও বিবিধ বৃক্ষ ও ফুলশোভায় মনোরম করিয়া রাখা হইয়াছে। সৈনিকগণের সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় প্রায় সকল কেন্দ্রেই পাইয়াছি। আমাদের প্রাতরাশের সময় মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজিতে আরম্ভ করিল।

রাজৌরী শহর হইতে S. D. O. এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও জনকয় মেম্বর আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। দুইজন ইউ.এন.-এর অফিসারও ছিলেন। স্থানীয় লোকের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একজন এম.এল.-এর (রাজৌরী কেন্দ্রের প্রতিনিধি) সঙ্গে আলাপ হইল। শেখ আবদুল্লার আমল অপেক্ষা বর্তমান আমলে লোক অধিক সুখে আছে, পুনঃ পুনঃ ইহা বলিলেন। টাউন মিউনিসিপ্যালিটির আয় বেশী নহে। আয় বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে, চেয়ারম্যান তাহা জানাইলেন। শহরে বিদ্যালয় আছে—উচ্চ বিদ্যালয়। চিকিৎসালয় আছে। মেয়েদের স্কুলও আছে।

রাজৌরী শহর ও গ্রাম পাকিস্তানীরা দখল করিয়া লয়। লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। এখানে হানাদাররা প্রায় ২৫০০ লোককে হত্যা করে। হত্যার পরে মৃতদেহগুলি জড় করিয়া আগুন জ্বালায়। স্থানীয় লোক পরে ভস্মীভূত স্থানে আংটি প্রভৃতি কুড়াইয়া পায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোককেই হত্যা করা হয়। উভয় সমাজের নারীই লাঞ্ছিতা হয়। তবে হিন্দুনিগ্রহকালে পাকিস্তানী হানাদারগণের সঙ্গে স্থানীয় গুণ্ডা-বদমায়েস শ্রেণীর কতক মুসলমান যে যোগ দেয়, তাহা বিশিষ্ট মুসলমানরাও স্বীকার করিলেন।

রাজৌরীর উদ্ধারসাধন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অপূর্ব বীরত্ব ও সামরিক কৌশলের নিদর্শন। রাজৌরীর যুদ্ধে পাকিস্তানীদেরও প্রভূত

ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহারা বিভিন্ন পথে বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিয়াছে। ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের যথেষ্ট প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান দেখিলাম। রাজৌরীর একজন কবিকে… জেনারেল তাঁহার কবিতা শুনাইতে বলিলেন। উর্দু কবিতা সুর করিয়া

কাশ্মীরের যুদ্ধকালে কলিকাতার ডাক্তার মেজর (এখন কর্ণেল) বরাট আহত জওয়ানের দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া বুলেট বাহির করিতেছেন

শুনাইলেন—সুন্দর প্রেমের কবিতা। এই সময় আমাদের নবাব আবেদ আলী—হায়দরাবাদের রিয়াসতের সম্পাদক—একটি অনুরূপ প্রেমের কবিতার দুইটি চরণ শুনাইলেন। এখানেও বিভিন্ন অফিসার ও জোয়ানদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহাদের মনোবলের পরিচয় পাইলাম।

স্থানীয় লোকদের কথায় বুঝিলাম—সৈন্যদের অবস্থানের জন্য তাহারা নির্ভয়ই শুধু নহে, তাহারা কৃতজ্ঞ। হানাদারদের অত্যাচার হইতে

রাজৌরী অঞ্চলে যুদ্ধকালে ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক শত্রুঘাঁটি আক্রমণের দৃশ্য

তাহারা বাঁচিয়াছে ; বিধ্বস্ত শহর ও পল্লীর পুনর্গঠনে এবং নিগৃহীত ও সর্বরিক্ত জনগণের পুনর্বাসনে সাহায্য পাইয়া তাহারা অশেষ কৃতজ্ঞ।

যুদ্ধকালে এবং পরেও স্থানীয় লোক সেনাবাহিনীর কাছে চিকিৎসার বহু সুযোগ পাইয়াছে।

একটি স্থানে—স্থানটির নাম উল্লেখ করিব না—প্লাস্টার-রং-মাটিতে তৈরী বিরাট একটি সামরিক ম্যাপ মেঝেতে দেখিলাম। জম্মু-কাশ্মীরের, সীজ-ফায়ার লাইনের, রাস্তার, নদ-নদীর, পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা সমেত রিলিফ ম্যাপ রাখা হইয়াছে। একটি বেশ প্রশস্ত ঘরে (ঘরটি বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই—মিলিটারী সিক্রেট)। মিলিটারী অফিসারগণ দীর্ঘ যষ্টি সহযোগে আমাদের বুঝাইতে লাগিলেন, কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি। এত বড় ম্যাপ এইভাবে গড়িয়া তুলিতে বহু সময় ও বহু শ্রমনিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে। এই ম্যাপ দেখিয়া আমাদের সঙ্গী মিঃ রাও ফটো নিবার অনুমতি চাহিতেই অফিসার বলিলেন, তাহা হইবার উপায় নাই। কেননা, উহা সামরিক গোপন তথ্য। মিলিটারী সিক্রেট সর্বত্রই সতর্কতার সহিত সুরক্ষিত দেখিলাম।

* * *

বিম্বরগলিতে মোগল রোড ধরিয়াই যাইতে হয়। আমরা প্রায় ২॥টায় সেখানে পৌছিলাম (১৪ ৯।৫৬)। সেখানে সৈন্যবাহিনীর কোয়ার্টার্সে (অতি নির্জন শান্ত সুন্দর পরিবেশে এই ঘাঁটি) কর্ণেল থাপার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। গুর্খাবাহিনীর অন্যতম নায়ক। তিনি পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী হইয়া প্রায় দুই বৎসর আটক ছিলেন।·········সহসা চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা হইয়াছিলেন অবরুদ্ধ। খাদ্যাভাব দেখা দেয়। রেশন সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে; শাকপাতা সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছেন। গুলীগোলারও অভাব হইয়া পড়িল। পাকিস্তানীদের নিকট তাঁহাদের বন্দী-অবস্থায় যে নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা বর্বরতার ও নৃশংসতার চূড়ান্ত। সামান্য ছুতানাতায় বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের তাহারা গুলী করিয়া মারিয়াছে। তাহাদের ক্যাম্পে নিয়া খাদ্য দিবার প্রয়োজন এড়াইবার

জন্যও গুলী করিয়া মারিয়াছে। এইরূপ অত্যাচার সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট পাকিস্তানের নিকট জোর প্রতিবাদ জানান; ইউ.-এন. হইতেও ইহা লইয়া কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। ইতিমধ্যে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষও গুলী করিয়া মারিয়া না ফেলিতে বোধ হয় নির্দেশ দেন। গুলী করা বন্ধ হয়। অবশেষে ইউ.এন.-এর প্রভাবে এবং পাকিস্তানের নিজেদের প্রয়োজনে উভয় পক্ষের বন্দী বিনিময়ের সূত্রে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। যুদ্ধবন্দীদের উপর এইরূপ ব্যবহার কোন সভ্য রাষ্ট্র করিতে পারে না। কর্ণেল থাপা মৃদু হাসিয়া তাহাই জানাইলেন।

বিম্বরগলি হইতে আমরা সুরনকোট ঘাঁটিতে পৌঁছিলাম। সুউচ্চ টিলার উপর বর্তমানে সামরিক কোয়ার্টার্স। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া মিলিটারী যানবাহন, সাজসরঞ্জাম, জোয়ানদের ছাউনি। বহু সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিতে হয় বলিয়া আমি জীপেই রহিলাম। কর্ণেল গাড়ীতে চা ও আনুষঙ্গিক খাদ্যদ্রব্য পাঠাইলেন। আমি শুধু চা গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদ জানাইলাম।

পুঞ্চ

এবার সেই বিখ্যাত পুঞ্চ। পুঞ্চের নদীতে সেতু নাই। সঙ্কীর্ণ একটা নালাপথ পার হওয়ার পূর্বে জোয়ানদের ছাউনি দেখিলাম। তাহাদের খেলাধূলাও দেখিলাম। একটি একটি করিয়া আমাদের জীপগুলি অতি সন্তর্পণে এই গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারী চেকপোস্ট পার হইল। রাত্রি আটটায় পুঞ্চে পৌঁছিয়া ডাকবাংলোতে উঠিলাম। পুঞ্চ-এর রাজার বাড়িটিতে এখন মিলিটারী কোয়ার্টার্স। সেখানেই নৈশভোজনের ব্যবস্থা। মিলিটারীরই আমরা অতিথি। প্রাচীন রাজবাড়ি। এখানে বহু উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী সমবেত হইয়াছিলেন। আমাদের সৈন্যবাহিনীর জোয়ানদের সম্পর্কে সর্বত্রই অফিসারদের উচ্চ ধারণা দেখিয়াছি। একজন অফিসার বলিলেন, 'জোয়ানদের সম্পর্কে আমরা যে-ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছি, তাহা পাকিস্তান বা অন্যান্য অনেক দেশ অপেক্ষা ভাল, তবে মার্কিন সৈন্যদের তুলনায় তাহা অনেক নিচু। কিন্তু

তবু আমাদের জোয়ানরা প্রফুল্লচিত্ত। আর খাবার? খুব সুস্বাদু, মুখরোচক খাদ্য না হউক, স্বাস্থ্যের দিক দিয়া আমাদের জোয়ানদের খাদ্য বেশ ভাল। স্বাস্থ্য যাহাতে খাসা থাকে—এই বিষয়ে সৈন্যবিভাগ বিশেষ সজাগ। দেখুন উহাদের স্বাস্থ্য!' সত্যই খাসা!

ছুটি সম্পর্কে প্রশ্ন করিলাম। কর্ণেল বলিলেন, 'বাড়ির প্রয়োজনে, মায়ের অসুখে ছুটি চাহিলে, ছুটি আমরা দিয়া থাকি। কিন্তু সময় সময় প্রাকৃতিক বাধা এমন দেখা দেয়, যেমন ধরুন ঝড়বাদল—সাধ্য নাই যাইবার, প্লেনও যায় না। তাই ছুটি পাইয়াও জোয়ানকে কখনো কখনো ১৫ দিন অপেক্ষা করিতে হয়।'

পুঞ্চ প্রাচীন শহর। পাকিস্তানী হানাদার-বাহিনী বিভিন্ন দিক হইতে পুঞ্চ আক্রমণ করে, পুঞ্চ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে—প্রায় ৬ মাসকাল।

প্রীতম সিং, আত্মা সিং পুঞ্চ-যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহারা সসৈন্য যে বীরত্ব, ধৈর্য ও সামরিক কৌশল প্রদর্শন করেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পুঞ্চ আক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে, শতে শতে, সহস্রে সহস্রে নরনারী আত্মরক্ষা ও নারীর সম্মান রক্ষার জন্য দূর পল্লীর দিকে সরিয়া যাইতে লাগিল। পাকিস্তানী হানাদারগণের আক্রমণের বীভৎসতা ও নৃশংসতার এবং লুণ্ঠনাদির সংবাদ তাহারা পূর্বেই পাইয়াছে। আত্মরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থাও নাই; তাই জনগণ পল্লীতে জঙ্গলে যেখানে সম্ভব আত্মগোপন করিতে লাগিল। শহরে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। পল্লীতে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। স্থানীয় হিন্দুগণের নিকট জানিলাম—তাহারা তখন মুসলমানের গৃহেই প্রথম আশ্রয় লইয়াছিল। আর প্রকৃত প্রস্তাবে পুঞ্চের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদ বিসম্বাদ ছিল না। স্থানীয় মুসলমানগণ প্রথমদিকে তাহাদের আশ্রয়ও দিয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তানী হানাদাররা মুসলমানদেরও যখন শাসাইতে আরম্ভ করে এবং লুণ্ঠন ও নিগ্রহের ভয় দেখাইতে থাকে, তখন মুসলমানেরা হিন্দুদের চলিয়া যাইতে বলে; বলে, আমাদের বিপদ ঘটিবে। যে-সকল হিন্দু প্রতিবেশী বা পরিচিত

মুসলমানের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা তখন অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। যেমন হিন্দুগণকে হানাদাররা নানাভাবে নিগ্রহ করিয়াছে, বহু মুসলমানও তাহাদের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান নারীরা সমভাবেই হানাদারদের দ্বারা নির্যাতিতা হইয়াছে। শিখদের কথাই হানাদাররা বেশী জিজ্ঞাসা করিয়াছে। অর্থাৎ শিখদের উপরেই আক্রমণকারীদের আক্রোশ যেন অধিক। পুঞ্চের কোন কোন হিন্দু—যাঁহারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, কোন প্রকারে প্রাণে বাঁচিয়া বর্তমানে পুঞ্চে ফিরিয়া বসবাস করিতেছেন—তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ বলিলেন, 'কোন কোন মুসলমান আত্মরক্ষার জন্যই হউক, স্বার্থের লোভের বশবর্তী হইয়াই হউক, হানাদারদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে, পাকিস্তানীদের দলভুক্ত হইয়াছে, লুণ্ঠনাদিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে'।

পুঞ্চের (শহরের) বিশিষ্ট নাগরিক জনকয় আমাদের সঙ্গে ডাক-বাংলোতে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইহা ছাড়া আমরা শহরে গিয়াও কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাই।

পুঞ্চ ডাক-বাংলোতে যখন পুঞ্চ আক্রমণ, অবরোধ এবং পরে পুঞ্চ উদ্ধারের প্রসঙ্গ চলিতেছিল, তখন কে একজন পাক সৈন্য বা Pak-Army শব্দটি ব্যবহার করেন। পুঞ্চের অধিবাসী একজন বৃদ্ধ শিখও সেখানে ছিলেন। 'সৈন্য' কথাটি শুনিয়াই বৃদ্ধ শিখ ভদ্রলোকটি মাথা নাড়িয়া জোর প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন, "না না, ওরা 'সৈন্য' নয় ; ওদের সৈন্য বলিবেন না, ওরা লুঠেরা, বদমায়েস, খুনে। সৈন্য কখনো এমন কলঙ্কের কাজ করে না। তারা যুদ্ধ করে। ওরা ত যুদ্ধ করে নাই। লুঠ করিয়াছে, আগুন জ্বালাইয়াছে, ছেলে বুড়োকে মারিয়া ফেলিয়াছে, মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করিয়াছে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক সজলচক্ষু হইলেন। হানাদারদের হাতে তাঁহারা নিগৃহীত হইয়াছেন ; শুধু ইহাই তাঁহার দুঃখ নহে। তিনি সৈন্যবিভাগে ছিলেন। ভারতীয় সৈন্য (সে সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু-শিখ-মুসলমানও ছিল) কখনও এইরূপ লুণ্ঠন, নারীধর্ষণাদি জঘন্য কার্য করে নাই, করিতে পারে না, করে না। যাহারা এইরূপ জঘন্য কার্য করিয়াছে,

তাহাদের তিনি সৈন্য বলিতে সম্মত নহেন ; ইহাদের সৈন্য বলিলে (পাকিস্তানী সৈন্য হইলেও) সৈন্য নামের অপমান করা হয়,—ইহাই বৃদ্ধ শিখ ভদ্রলোকের সেদিনের বক্তব্য। সৈন্য সম্পর্কে তাঁহার এইরূপ উচ্চ ধারণা দেখিয়া আমরা খুশী হইলাম।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রীতম সিং পুঞ্চে ডিফেনসিভ যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। শত্রুকে, অগ্রবর্তী হইয়া, আক্রমণে বিরত থাকেন। উদ্দেশ্য অধিকতর সমরসম্ভার ও সামরিক শক্তি লাভ করিয়া প্রবল আক্রমণ চালাইবেন। তাই, কেবল আত্মরক্ষামূলকভাবে ঘাঁটিগুলি রক্ষা করিয়া যাইতে থাকেন। ইহার ফলে পুঞ্চ শহর ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়।

পুঞ্চের বিমানঘাঁটিটি রক্ষা করাও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কৃতিত্ব। পাকিস্তানী বাহিনী বিমান লইয়া আসিয়া ঘাঁটিটি ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। ওখানে যে হাসপাতালটি ছিল, সেই বাড়ির উপর বোমা ফেলিয়া উহার আংশিক ধ্বংস সাধনে সক্ষম হয়। ঐ বাড়ির অবশিষ্ট অংশ এখনও বিদ্যমান। উহা বর্তমানে যথারীতি ব্যবহৃত হইতেছে দেখিলাম। ভারতীয় দুইটি বিমানের ধ্বংসাবশেষ এখনও ঐ বিমান-ঘাঁটিতে রহিয়াছে। ভারতীয় বিমানবহর যথাসময়ে আসিয়া না পৌঁছিলে পুঞ্চ বিমানঘাঁটিটি হানাদারদের কবলিত হইত। বলা বাহুল্য, পুঞ্চ বিমানঘাঁটি এবং শ্রীনগরের বিমানঘাঁটি ধ্বংস করিবার জন্য পাকিস্তানী বাহিনী যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এই বিমানক্ষেত্র ধ্বংস করিতে পারিলে ভারতীয় বিমান, সৈন্য, রসদ, সামরিক উপকরণাদি পৌঁছাইতে পারিবে না, দ্রুত সাহায্য পাঠান সম্ভব হইবে না, সেই দিক বিবেচনা করিয়াই পাকিস্তানীরা মরিয়া হইয়া বিমান-ঘাঁটি ধ্বংস করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু ভারতীয় বিমান বহরের তৎপরতা ও দক্ষতা তাহাদের এই আশাও ব্যর্থ করিয়া দেয়।

পুঞ্চ শহর অবরোধকালেই ভারতীয় বিমান পুঞ্চের উদ্বাস্তুদের উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে আনিয়াছে। কয়েক দিনের মধ্যে পুঞ্চের

প্রায় ৩০ সহস্র নরনারীকে বিমানের সাহায্যে উদ্ধার করা হয়। এই উদ্ধারকার্য সহজ ছিল না। শত্রুদের হানা ও বাধাদান প্রভৃতি

আই. এ. এফ-এর ডাকোটা বিমানযোগে ভারতের পুঞ্চ হইতে দুর্গত নরনারীদের অন্যত্র অপসারণের দৃশ্য

বিপদ মাথায় করিয়াই দ্রুত উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করিয়াছে। সৈন্য-বাহিনীতে পুঞ্চের নরনারীর এই উদ্ধারকার্য 'পুঞ্চিং' নামে খ্যাত হইয়াছে।

পুঞ্চ যুদ্ধ জয়ের পক্ষে ভারতীয় বাহিনীর সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থাটি বিশেষ সহায়ক। শহীদ জেনারেল আত্মা সিংয়ের বীরত্ব ও নেতৃত্ব-নৈপুণ্য সামরিক সংযোগ-রক্ষাব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়াছিল। আত্মা সিংয়ের এই কৃতিত্ব সর্বত্র প্রশংসিত হয়—সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে তাঁহার এই সাফল্যে অভিনন্দিত করেন। প্রায় ৬ মাস পরে পুঞ্চ শহর উদ্ধার পায়। পাকিস্তানী হানাদারগণ যখন বুঝিতে পারে, এইবার সরিয়া পড়িতে না পারিলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তাহাদের ঘিরিয়া পিষিয়া মারিবে, তাহাদের রসদ পৌঁছানও আর সম্ভব নহে—ভারতীয় বিমানবাহিনীও তখন দুর্বার ও দুর্জয়—তখন তাহারা দ্রুত সরিয়া পড়িতে আরম্ভ করে।

পুঞ্চের সহিত সংযোগ সাধনের প্রয়াস সফল হওয়ায় জেনারেল শ্রীনাগেশ (দক্ষিণে) মেজর জেনারেল আত্মা সিংকে অভিনন্দন জানাইতেছেন। আত্মা সিং পরে পরলোকগমন করেন।

পুঞ্চের একজন হিন্দু অধিবাসীর সঙ্গে শহরের পথে আলাপ হইল। বর্তমানে তিনি দেরাদুনে ব্যবসায় উপলক্ষে থাকেন। বন্ধু-পরিজন কিছু পুঞ্চেই আছে। আক্রমণের সময় তিনি পুঞ্চ ত্যাগ করেন। তাঁহার কতক সম্পত্তি বর্তমানে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে। স্বভাবতই এই সম্পত্তির মায়া তাঁহার আছে। 'আজাদ কাশ্মীর'-এ অবস্থিত কোন কোন মুসলমান (তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবসায়-সম্পর্ক ছিল) এখনও তাঁহার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য পুঞ্চে আসিয়াছেন। বলিলেন, 'আজাদ কাশ্মীর'-এর ঐ সকল মুসলমানও তাঁহার নিকট জানিতে

চাহেন—তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কি? তাঁহারা আজাদ কাশ্মীরে অত্যন্ত কষ্টে আছেন। তাঁহাদের ব্যবসায়-সম্পর্ক ছিল পুঞ্চের হিন্দু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুঞ্চে ফিরিয়া আসিতে ব্যগ্র। এই হিন্দু ভদ্রলোকই বলিলেন যে, তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট খোঁজ লইয়া জানিয়াছেন যে, এখন ঐ সকল মুসলমানের ('আজাদ কাশ্মীর'-এ যাঁহারা আছেন) কাশ্মীরে ফিরিবার অনেক বাধা। ঐ ভদ্রলোককে আমরা প্রশ্ন করিলাম, "আপনি পুঞ্চে আসা-যাওয়া করিতেছেন দেখা যায়। আপনি একেবারে আসিয়া এখান হইতে পূর্ব-ব্যবসায় আরম্ভ করিতেছেন না কেন?" অতঃপর তাঁহার দ্বিধার কারণ বুঝিলাম। পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে তাঁহাদের ভাল সম্পত্তি আছে। (এখানে উল্লেখযোগ্য, কাশ্মীরের লোক বা ভারতীয় সৈন্যরা কেহ আজাদ কাশ্মীর বলেন না; বলেন—পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর।) সেই সম্পত্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই তিনি চিন্তান্বিত।

* * *

পুঞ্চের নাগরিকগণের কতক প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে রাত্রে দেখা করেন, পরদিন প্রাতেও আসেন (১৪।৯)। এই দলে একজন উচ্চশিক্ষিত যুবকও ছিলেন। পুঞ্চ শহর আক্রান্ত হইলে তাঁহারা প্রথম দূরপল্লীতে মেয়েদের পাঠান। তারপর অবস্থা ভয়াবহ হইতেছে দেখিয়া তাঁহারাও চলিয়া যান। পুঞ্চ উদ্ধারের পরে ফিরিয়া আসেন। তিনি ন্যাশনাল কনফারেন্সেরও একজন সদস্য। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গী ভদ্রলোকগণ তাঁহাদের অসুবিধাগুলি আমাদের জানান। পুঞ্চে আসিবার পথে নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করা দরকার, যাহাতে বাস আসিতে পারে। যোগাযোগের অভাবে তাঁহাদের ডাক পাইতে অসুবিধা হয়। বৃষ্টি হইলে টেলিগ্রাম (শ্রীনগর হইতে) আসিতে ৭।৮ দিন লাগিয়া যায়। আর একটি প্রয়োজন—মেয়ে হাসপাতাল, বিশেষ করিয়া Maternity। আমি যুবকটিকে একান্তে বলিলাম, "দেখুন, আমরা প্রেসের লোক।

সরকারী কন্‌ডাক্টেড্‌ টুর—এটা আদৌ নয়। বর্তমান কাশ্মীর গবর্নমেণ্ট সম্পর্কে আপনাদের সত্যকার অভিমতই আমরা শুনিতে চাই। আপনারা নির্ভয়ে বলিতে পারেন, আপনার নামও আমরা উল্লেখ করিব না।” তখন ভদ্রলোকটি বলিলেন, “শেখ আবদুল্লা মন্ত্রিত্বকালে সাধারণের জন্য বিশেষ কিছুই করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। তাঁহার সময় রাজার আমল অপেক্ষা ভাল কিছু দেখি নাই। তাঁহার রাজনৈতিক মত ও আদর্শের পরিবর্তন হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। তবে তাহা লইয়া কিছু বলিতে চাহি না, কারণ ব্যক্তিগত জ্ঞান সে-সম্পর্কে আমার নাই। তবে অকপটে এ-কথা বলিতে পারি যে, বর্তমানে বক্সী সাহেবের আমলে জনসাধারণ অনেক ভাল আছে। আর্থিক দিক দিয়া, খাদ্য-সমস্যার দিক দিয়া অনেক ভাল আছে। অবশ্য আমাদের রাস্তাঘাটের বিশেষ করিয়া সেতুটির অভাবের কথা আমরা তাঁহাকেও জানাইয়াছি। তিনি আশাও দিয়াছেন। কিন্তু ফল হয় নাই।” আমরা তাঁহাকে বলিলাম, “শ্রীনগরে গিয়া আপনাদের অসুবিধার কথা আমরা প্রসঙ্গত অবশ্য বলিব।” আমরা উচ্চতম স্তরে কথাগুলি সুযোগমত জানাইয়াছি। পুঞ্চ বিমানঘাঁটিতেও তাঁহারা আসিয়াছিলেন।

পুঞ্চের রাজা অন্যত্র থাকেন। পুঞ্চের প্রাচীন মন্দিরাদি দেখিলাম। পুঞ্চে একটি প্রসিদ্ধ কালীমন্দির এবং কালীমূর্তিও আছে।

শ্রীনগর

এইবার পুঞ্চ ত্যাগ করিয়া শ্রীনগর যাইবার পালা। পুঞ্চ উপত্যকার চারিদিকেই পর্বতমালা। পূর্বদিন আবহাওয়া ভাল ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধঘণ্টা পরে মিলিটারী প্লেন আসিল। একবারে আমাদের সকলের স্থান হইবে না—মালপত্রও অনেক, তাই দুইবারে আমাদের যাইতে হইবে। ঐ প্লেনটিই শ্রীনগরে গিয়া ফিরিয়া আসিবে। নিয়ম মাফিক লেখালেখি ইত্যাদি হইল। মিলিটারী প্লেনে আর কখনো যাই নাই। সিভিল প্লেনের মত আরামের ব্যবস্থা উহাতে নাই। প্লেনে উঠিবার পূর্বে মিলিটারী পাইলটের সঙ্গে (পাইলটটি বাঙালী)

আলাপ হইল। অফিসারের সঙ্গেও পরিচিত হইলাম। এবারে আমাদের প্যারাস্থট পরিতে হইল। এটা মিলিটারী দস্তুর। প্যারাস্থট যে এতটা ভারী হয় তাহা জানিতাম না। অনভ্যাস বলিয়া দস্তুরমত ভারী বোধ হইল ; আমার অন্তত মনে হইল—১৫ সের বোঝা। কিছুটা
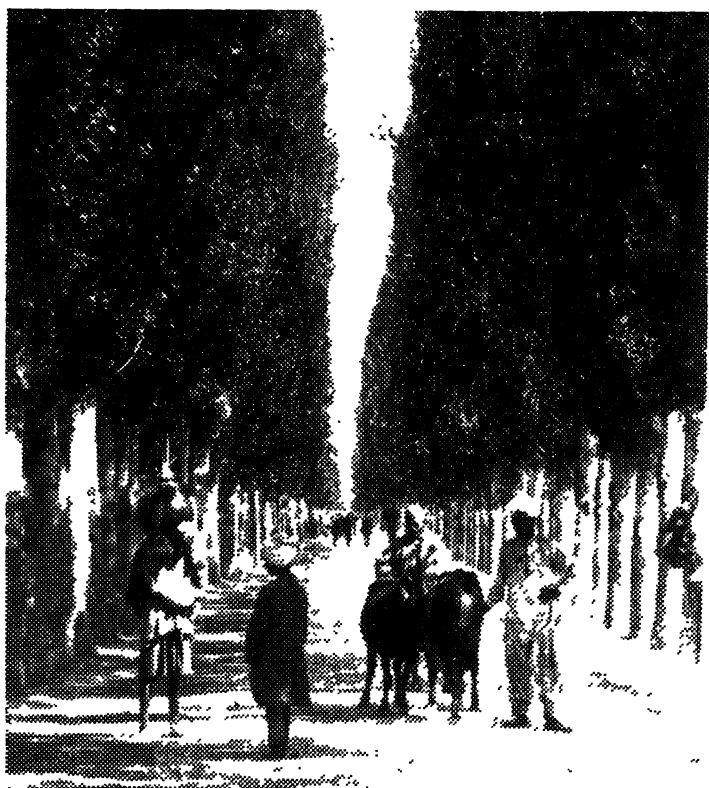
পপলার-বীথি, কাশ্মীর

অস্থবিধাও হইল। কিন্তু দুর্ঘটনার বিষয় বিবেচনা করিয়া মিলিটারীর এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হাসিমুখে মানিয়া লইলাম। আপত্তি করা বা অস্থবিধার কথা বলা—নিতান্ত ন্যাকামি মনে হইল। প্লেনটি ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া শ্রীনগরের দিকে রওনা হইল। আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়, মনোরম উপত্যকা, হরিৎক্ষেত্র, বনরাজী ও

নদীর অপরূপ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে পৌঁছিলাম। বেলা তখন ১০টা। শ্রীনগর বিমান-ঘাঁটিতে আমাদের দুর্গম পথের পরম সাথী—সেবাপরায়ণ, সদা-প্রস্তুত শ্রীকমলকুমার উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনগরের ব্যবস্থাদি দেখাশোনার জন্য একদিন পূর্বেই তিনি বিমানযোগে আসিয়াছিলেন। বিমানঘাঁটিতে মেজর পুরী (P. R. O., Army, Srinagar) এবং শ্রী জি. ডি. শর্মা জম্মু ও কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের P. I. O.-ও আমাদের প্রেস-পার্টির অভ্যর্থনার জন্য

শ্রীনগরের দৃশ্য

আসিয়াছিলেন। স্টেট বাসে শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হইলাম। শ্রীকমলকুমার জানাইলেন, আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা ডাল হ্রদে হাউস-বোটে হইয়াছে। পূর্বে প্যালেস হোটেলে থাকা হইবে—স্থির হইয়াছিল। বলিয়াছি, কমলকুমার পূর্বেই শ্রীনগরে আসেন। বলিলেন, এখানে সকলের অভিমত, শ্রীনগরে আসিয়া ডাল হ্রদে হাউস-বোটে থাকাই ভাল। বলিলাম, উত্তম হইয়াছে। ও-সব বড় বড় সাহেবী হোটেলের 'ফরম্যালিটি' হইতেও বাঁচা গিয়াছে। একেবারে নিজেরা নিজেরা যেমন খুশি বাড়ির মত থাকা যাইবে। হাউস-বোটই উত্তম ব্যবস্থা। শুধু আমি নই, পার্টির অধিকাংশই এই

ব্যবস্থাই উত্তম মনে করিলেন। তবে প্যালেস হোটেলে থাকার আকর্ষণ, অন্তত মনে, কাহারও ছিল না, এমন বলিতে পারি না।

কয়েক নম্বর সেতু অতিক্রম করিয়া শ্রীনগরে প্রবেশ করিলাম। ডাল হ্রদের বাঁধের ঘাট হইতে শিকারায় হাউস-বোটে যাইতে হয়। শিকারা পারাপারের ছোট নৌকা। শিকারাগুলির নামকরণ বিচিত্র—Roverও আছে, Kill Royও আছে, আর Dancing Girlও আছে। 'স্প্রিংয়ের গদি আঁটা' বলিয়াও আমন্ত্রণ জানায়। আমরা শিকারায় আমাদের নির্দিষ্ট হাউস-বোট Rover, Pigeon, Zazz প্রভৃতিতে (একটি House Boat-এর নাম Buckingham Palace,

হাউস-বোট, কাশ্মীর

বাকিংহাম প্যালেস নামে আকৃষ্ট হইয়া একটি ব্রিটিশ দম্পতি স্থান লইয়াছেন দেখিলাম) গেলাম। আমাদের হাউস-বোটের বরাবরই শ্রীনগরে ডাল হ্রদের পাড়ে পর্বতচূড়ায় শঙ্করাচার্যের মন্দির। হাউস-বোট হইতেই স্পষ্ট দেখা যায়। আমরা শ্রীনগরে হাউস-বোটে দিন এগার ছিলাম। এখান হইতেই বাকি যুদ্ধবিরতি লাইন এবং শ্রীনগরের ও কাশ্মীরের দ্রষ্টব্য যাহা কিছু প্রায় সবই দেখিয়াছি।

আমরা দেখিয়াছি—ডাল হ্রদ, চাঁদের আলোয় উহার অপূর্ব শ্রী, উলার হ্রদ, মানসবল, আচ্ছাবল, গুলমার্গ, কিনানমার্গ, অনন্তনাগ,

ভেরিনাগ, মোগল বাদশাহদের সালিমার, নিশাতবাগ, চেস্‌মিবাগ ; ক্ষীরভবানী, অনন্তবর্মার অনন্তপুর, ললিতাদিত্যের বিস্ময়কর সৃষ্টির ধ্বংসাবশেষ ; পহালগাঁও, কুদ, বানিহাল টানেল, প্রাচীন বিতস্তা তথা ঝিলমের স্নিগ্ধ শান্তশ্রী, লীডার নদীর কলপ্রবাহ। আর ফিরিবার পথে ভাখ্‌রা-নাংগাল, গুরুগোবিন্দের জন্ম ও কর্মস্থান আনন্দপুর প্রভৃতি। ইহা ছাড়া কাশ্মীরে কৃষি-শিল্পাদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টা দেখিয়াছি। এই সকল সম্পর্কে প্রসঙ্গত কিছু বলিব।

এবার পুনরায় অবশিষ্ট সীজফায়ার লাইন দেখিতে যাইতেছি।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি শ্রীনগর শহরের কাছাকাছি হানাদাররা আসিয়া পড়িয়াছিল। বারমুলার রাজপথ ধরিয়া আসিয়াছে, পাহাড় ডিঙ্গাইয়া আসিয়াছে। শ্রীনগরের কিছু দূরে, পাট্টানের ৭ মাইল আগে প্রথম ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তান-বাহিনীর সম্মুখীন হয়। প্রবল যুদ্ধ হয়। পাক-বাহিনীর শ্রীনগর প্রবেশের আশা দুরাশায় পর্যবসিত হয়। পাক-সৈন্য ভারতীয় বাহিনীর প্রবল আক্রমণে শেষ পর্যন্ত পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ভারতীয় বাহিনীর কর্ণেল রায় এখানেই যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন। পাহাড়ের গায়ে একটি স্মৃতিফলক রহিয়াছে। স্থানটির নাম কমলপুরা। ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৭ এখানে সংঘর্ষ হয়। হানাদাররা কাশ্মীর আক্রমণ করে—২২শে অক্টোবর।

বারমুলা

বারমুলা একটি বড় শহর। এইখানে চলে পাকিস্তানী হানাদার-দের লুণ্ঠন—পীড়ন—অমানুষিক হত্যালীলা। বারমুলার প্রখ্যাত শহীদ মকবুল হোসেন সিরোয়ানীকে* এখানে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাঁহাকে রাস্তায় ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার জীবনদানের পবিত্র স্মৃতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তাহা দেখিলাম। বারমুলার অদূরে অবস্থিত মাহারো 'পাওয়ার হাউস' পাকিস্তানীরা ধ্বংস করিয়া ফেলে। বারমুলার স্থানীয় যুবকগণ সিরোয়ানীর নাম করিয়া গৌরব বোধ

*সিরোয়ানী ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

করিতে লাগিলেন,—বলিলেন ঃ—সিরোয়ানীকে পাকিস্তানীরা তাহাদের দলভুক্ত হইতে প্রলুব্ধ করে, চাপ দেয়। সিরোয়ানীকে দলভুক্ত করিতে পারিলে আক্রমণকারীদের অনেক সুবিধা হইবে—এই ভাবিয়া তাহারা প্রথমটায় তাঁহাকে দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন আরম্ভ হয় নিপীড়ন। ভয়াবহ সেই নিপীড়নের কাহিনী বারমুলা আক্রমণকালেই প্রকাশিত হইয়াছিল। সিরোয়ানীকে প্রকাশ্য রাস্তায় হত্যা করা হয়। সিরোয়ানীর সাহস বীরত্ব ও কৌশলের জন্য পাকিস্তানী হানাদাররা কতকটা সময়ের জন্য যে বাধা পাইয়াছিল—স্থানীয় লোকের ধারণা—তাহাতেই শ্রীনগর রক্ষা পায়। কারণ এখানে বিলম্ব হওয়ার দরুণই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী শ্রীনগর রক্ষার্থে আসিয়া পৌঁছাইতে সক্ষম হয়। বারমুলার রাজপথে সিরোয়ানীর স্মৃতি রক্ষিত আছে। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে একটি বিদ্যালয়ও ওখানে পরিচালিত হইতেছে। বারমুলার উপর পাকিস্তানী হানাদার-গণ যে নারকীয় অত্যাচার ও হত্যালীলার তাণ্ডব চালাইয়াছিল—বারমুলার ধূলিকণায় আজও বুঝি তাহা মিশিয়া রহিয়াছে।

উরি

উরি সীজফায়ার লাইন বরাবর এবার আমরা যাত্রা করিলাম। রাস্তা অপরাপর সীজফায়ার লাইনের মত অতটা দুর্গম না হইলেও—কতকটা রাস্তা বেশ মারাত্মক রকমেরই বিপদ-সঙ্কুল। এখানে পাহাড়ে হানাদারদের সঙ্গে লড়িতে হইয়াছে—বিতাড়িত করিতে হইয়াছে। উরি নালা নামে খ্যাত নালা ও সেতু দেখিলাম। এই সেতু হানাদারগণ ধ্বংস করে। ভারতীয় সৈন্যগণ পুনর্নির্মাণ করিয়া অগ্রসর হয়। এখানকার যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ। উভয়পক্ষেই বহু হতাহত হয়। খ্যাতনামা সমরনায়ক নন্দ সিং এবং বাগসেন প্রভৃতি এই উরি নালার যুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করেন। আরো অনেকের নামেই স্মৃতিফলক খোদিত রহিয়াছে দেখিলাম; সুন্দরভাবে এই নালার ধারেই উহা সুরক্ষিত রহিয়াছে। এই স্মৃতিফলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমরা

উরি সীমান্তের দিকে রওনা হইলাম। সীজফায়ার লাইন বা সীমান্তের সর্বত্র চেক্ পোস্ট। চেক্ পোস্ট অতিক্রম করিতে হইলে মিলিটারীর অনুমতি প্রয়োজন, নামোল্লেখ—প্রভৃতি লেখালেখির আবশ্যক। আমাদের সঙ্গে সামরিক P. R. O. বরাবরই ছিলেন। পূর্বাহ্নে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং চেক্ পোস্টে অধিক বিলম্ব হইল না। তথাপি কখনো কখনো নির্দিষ্ট সামরিক ঘাঁটিতে পৌঁছাইতে ২।৩ ঘণ্টাও বিলম্ব হইয়াছে। তাহার কারণ অনেকটা আমাদের দ্রষ্টব্য সব দেখা এবং স্থানীয় অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করা। উরি যাওয়ার পথে একটি সামরিক ঘাঁটিতে উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। একজন ক্যাপটেন আমাদের জন্য নিকটবর্তী চেক্ পোস্টে প্রায় দুই ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উরি সীজফায়ার লাইনের নিকটবর্তী হইতেই আমাদের যতগুলি মিলিটারী জীপ্ ছিল—তাহা থামাইয়া গাড়ির প্লেটে নম্বরগুলি কাদামাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। মিলিটারী অফিসারগণ তাঁহাদের সামরিক নিদর্শন-সূচক ব্যাজ ইত্যাদি খুলিয়া ফেলিলেন—রিভলবার খুলিয়া রাখিলেন, সতর্কতামূলক এই ব্যবস্থা করিতেই হয়। এখান হইতে অতঃপর আমরা জীপে একটা পাহাড় ঘুরিয়া কতক দূর গিয়া নামিয়া পড়িলাম—বেশ কিছুটা হাঁটিয়া শেষ চেক্ পোস্টে পৌঁছাইলাম। একটু দূরেই আমাদের পিকেট। উহারই দুই শত গজ দূরে—পার্বত্য নদীর পারে পাকিস্তানী পিকেট অবস্থান করিতেছে। উহারা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিল। সম্মুখে পাণ্ডু পাহাড়। ইহার উচ্চতা ৯১৭৪ ফুট। শ্রীনগর হইতে উরি ৮৩ মাইল।

উরি হইতে ফিরিবার পথে রামপুর মিলিটারী কোয়ার্টার্স-এ আমরা লাঞ্চের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। অদূরে উচ্চ পাহাড়। কোয়ার্টার্স-এর একেবারে গা ঘেঁষিয়া শান্ত-স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ ঝিলম বহিয়া চলিয়াছে। কি শান্ত পরিবেশ, ফুল ও বিবিধ গাছপালার কি চমৎকার শোভা! ঝিলমের পারে বাঁধানো বেদীতে বসিয়া কিছুকাল নদীর শান্ত-শ্রী উপভোগ করিলাম। সৈন্যদের সৌন্দর্যবোধের বহু পরিচয়—

প্রায় সর্বত্রই দেখিলাম। সৈন্যদের মধ্যেও যে কিরূপ সৌন্দর্যপিপাসু শিল্পী-মন রহিয়াছে তাহা বিভিন্ন কোয়ার্টার্স-এ এবং জোয়ানদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দেখিয়াছি। যতটুকু, যে-স্থানই তাহারা পাইয়াছে, তাহাই সুন্দর করিয়া লইয়াছে। অনেক বসবাসের স্থানই অস্থায়ী, তথাপি বসিবার, থাকিবার ও আহারের স্থান পরিচ্ছন্ন—ফিট্‌ফাট্, গাছপালা লতাপুষ্পে মনোরম করিয়া লইয়াছে। এখানকার মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন ছিল প্রচুর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। একেবারে বাঙালীর অভ্যস্ত ও প্রিয় পায়েস পর্যন্ত—চাল-দুধ-কিসমিস সংযোগে প্রস্তুত পায়েস ; মনে হইল, যেন বাংলার সুগৃহিণীর হাতের রান্না খাইতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের আদর আপ্যায়ন করিতে বাহিনীর নেতৃস্থানীয়গণই শুধু নহেন—সাধারণ সৈনিকরাও যেন আনন্দ পাইতেন। প্রায় সকল স্থানেই দুই একটি বিশেষভাবে রান্না-করা 'পদ' লক্ষ্য করিয়াছি। এইস্থানে পাইলাম পায়েস। জানি না—কোন বাঙালী অফিসার মধ্যাহ্ন ভোজনের 'মেনুতে' উহা যোগ করিয়াছিলেন কি না।

পাঠানকোট হইতে উরি পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর দিকের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে আমরা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমাদের এই সকল জোয়ানদের প্রতি আমাদের তথা ভারতের অসামরিক জনসাধারণের কিছু কর্তব্য আছে কি ? এই প্রশ্নটিই বিভিন্ন কেন্দ্রে আলোচিত হইয়াছে।

সামরিক নেতৃবর্গের এই সম্পর্কিত উক্তির মর্ম : আপনারা আমাদের জনসাধারণকে আমাদের দেশের এই সব জোয়ানদের সম্পর্কে সচেতন করিতে পারেন। ইহারা দুর্গম স্থানে দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করিতেছে, ঘরবাড়া ছাড়িয়া বহুদূরে রহিয়াছে। এমন জোয়ানও আছে যাহারা ইতিপূর্বে বরফও দেখে নাই ; কিন্তু তাহাদেরও প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে দায়িত্ব পালন করিতে হয়। এমন ঘটনা ঘটে—যখন গাঁ হইতে বৃদ্ধ পিতা বা বৃদ্ধ মাতা বা স্ত্রীর পত্র আসে—যাহাতে কোন মামলার কথা থাকে—প্রতিবেশী কর্তৃক অসুবিধা সৃষ্টির প্রসঙ্গও থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় বটে, কিন্তু এই

ধরণের পত্রাদি পাইলে পরিবারের জন্য জোয়ানগণ চিন্তিত হয়। ইহারা যদি জানে যে তাহাদের পরিবারবর্গকে দেখিবার, তত্ত্বতল্লাসী করিবার লোক পল্লীতেই আছে, আমাদের জোয়ানরা যেমন দেশরক্ষার দায়িত্ব লইয়া সুদূর দুর্গম স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে তেমনি দেশের লোক তাহাদের পিতামাতা-স্ত্রীপুত্র কন্যাদের খোঁজ খবর নিতেছেন, তাহাদের কোন অসুবিধা দেখা দিলে পল্লীবাসীরাই আপনজনের মত দেখাশুনা করিতেছেন, তাহা হইলে জোয়ানরা নিশ্চিন্ত মনে দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব হাসিমুখে বহন করিবে। বস্তুত এই সকল জোয়ানদের প্রতি আমাদেরও যে দায়িত্ব আছে, এই চেতনা আমাদের মধ্যে জাগ্রত থাকা এবং সক্রিয় থাকা যে আবশ্যক, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যের অবস্থান ও অবস্থা দেখিবার সাধ ছিল। তাহা দেখিয়াছি। এস্থলে স্মরণীয় যে কাশ্মীরের মহারাজার আবেদনক্রমে ২৭শে অক্টোবর (১৯৪৭) কাশ্মীরের 'ভারতভুক্তি' সম্পাদিত হয়। ভারতভুক্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় বাহিনী শ্রীনগরে পৌঁছিয়া যায় এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিতে অগ্রসর হয়। ২২শে তারিখে প্রথম পাকিস্তান-পরিচালিত হানাদার বাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করে। এই বাহিনীতে উপজাতীয় লোক ছিল—পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর লোক ছিল—পরিচালক পাক-সামরিক নায়কগণ। কাশ্মীর রাজার সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। রাজবাহিনীতে ডোগরা-শিখ-মুসলমান ছিল। মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে কতক সেনানায়ক সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও প্রলোভনে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই অবস্থায়ই রাজসৈন্যেরা কাশ্মীর রক্ষায় অগ্রসর হয়। অনেকে প্রাণত্যাগ করে—বীরত্ব দেখায়। তন্মধ্যে কাশ্মীররাজের সেনাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং উরিতে তাঁহার সামান্যসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিপুল সংখ্যক পাকবাহিনীকে বাধা দেন, দুই দিন পর্যন্ত অসম-যুদ্ধে ঠেকাইয়া রাখেন—শহীদ হন। এই বাধাদানের ফলেও পাকবাহিনীর শ্রীনগরে পৌঁছাইতে বিলম্ব হয়। হানাদার বাহিনী চারিদিক হইতে আক্রমণ করে, রাজার অল্পসংখ্যক

সৈন্য চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া বাধা দিতে ছুটিয়া যায় বটে, কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহারা বিপাকে পড়ে। তাহারা আর প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম হয় না; কতক শত্রুকবলে পতিত হয়, কতক প্রাণ হারায়। প্রসঙ্গত বলা চলে কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃবর্গ ও কর্মিগণ (প্রায় সকলেই মুসলমান) পাকিস্তানী আক্রমণে বাধা দিতে অগ্রসর হন। শেখ আবতুল্লা ও বক্‌সী গোলাম মহম্মদ প্রভৃতি নেতৃবর্গ জনগণকে আত্মরক্ষার্থ সঙ্ঘবদ্ধ করিতে থাকেন। কাশ্মীররাজের ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের সম্পর্কে এবং তখনকার 'রাজনীতি' সম্বন্ধে যথাস্থানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এখানে জানিবার বিষয় এই যে পাকিস্তানী হানাদারগণ প্রায় ৭ দিনে একপ্রকার বিনা বাধায় উরি, বারমুলা, গুলমার্গ, ঝাঙ্গর, নওসেরা, রাজৌরি, পুঞ্চ, জজিলা, আখনুর, সায়েদাবাদ, মজঃফরাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল দখল করিয়া পাট্টান দখলের পর একেবারে শ্রীনগর দখল করিতে আগাইয়া আসিয়াছিল। বারমুলার মাহারো পাওয়ার হাউস ধ্বংস করায় শ্রীনগরে বৈত্যুতিক আলো আর তখন জ্বলে না, অন্ধকার। এমনই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী শ্রীনগরে পৌঁছাইয়াছে। অতঃপর ক্রমশ, কিন্তু নিশ্চিতভাবে, হানাদারদের পলায়নের পালা শুরু হয়। তাহারা উপত্যকা ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে ঘাঁটি করিয়াছে; ভারতীয় বাহিনী সেখানেও তাড়া করিয়াছে। পাক বাহিনীর অধিকৃত অধিকাংশ অঞ্চলই ভারতীয় বাহিনী পুনরধিকার করিয়া লইয়াছে। পাক সীমানার সংলগ্ন কতক স্থান (কাশ্মীরেরই অংশ) এখনও আক্রমণকারীদের হস্তে আছে। যেমন আছে মজঃফরাবাদ শহর। ভারতীয় বাহিনীর সেনানায়কগণ আর সাত দিন সময় পাইলে কাশ্মীরের অবশিষ্ট সকল এলাকাই পুনরধিকার করিয়া লইতে পারিতেন, ইহাতে তাঁহাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু সীজফায়ার লাইনের চুক্তিক্রমে ১লা জানুয়ারী, ১৯৪৯ যুদ্ধ বন্ধ হয়। সুতরাং ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তান-অধিকৃত যে-সকল অঞ্চল পুনরধিকার করিয়াছে সেইখানেই থামিয়া যায়। আর কাশ্মীরের অবশিষ্ট যে-অঞ্চল তখনও পাকিস্তানের দখলে ছিল, তাহা পাকিস্তানের

দখলেই রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য সেই অংশ পুনরধিকৃত এলাকার তুলনায় পরিমাণে অল্প। 'রাষ্ট্রপুঞ্জ' কর্তৃক একটা যুদ্ধবিরতি রেখাও ধার্য করা হইয়াছে। ভারতীয় বাহিনী বর্তমানে এই সীজ-ফায়ার লাইন বরাবর অবস্থান করিতেছে। আর ভারত ও পাকিস্তান সীমানা বরাবরও তাহারা অবস্থান করিতেছে। পাকিস্তান পররাজ্যলোলুপ হইয়া সহসা আক্রমণ চালাইয়া 'অপ্রস্তুত' জম্মু-কাশ্মীরে যে অনর্থ ঘটাইয়াছিল তাহার পুনরভিনয় আর যাহাতে কখনও সম্ভব না হইতে পারে, সীজফায়ার লাইনে এবং পাক-ভারত সীমানায় ভারতীয় বাহিনী তৎপ্রতি সচেতন ও অবহিত হইয়াই অবস্থান করিতেছে।

কী দেখিলাম?

সীজফায়ার লাইনে এবং ভারতসীমান্তে কী দেখিলাম? কাশ্মীর আসার পথে দিল্লীতে দুইজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তাঁহারা কেদারবদরী তীর্থে যাইতেছেন। ফিরিবার পথে একজনের সঙ্গে দিল্লীতে দেখা। তীর্থ দেখিয়া আসিয়াছেন। আমি বন্ধুকে বলিলাম, আমিও তীর্থ দেখিয়া আসিয়াছি। ভারত-তীর্থ। হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে অভীষ্ট কেদারনাথ দেখিয়া যেমন সর্বদুঃখের অবসান ঘটে, পরম প্রাপ্তির আনন্দে মন-প্রাণ ভরিয়া ওঠে, আমাদের সেনা-বাহিনীকে—বাহিনীর জোয়ানদের দেখিয়াও—পথের শত ক্লেশ মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। পরম প্রাপ্তি হইল বই কি। অখণ্ড ভারতের বাস্তব রূপ এই জোয়ানরা। ইহাদেরই মধ্যে সত্য হইয়া রহিয়াছে এক জাতি—এক প্রাণ—একতা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জোয়ানরা এখানে এক ও অবিভক্ত—অবিভাজ্য। সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই সত্য হইয়া রহিয়াছে ভারতীয় চেতনার বাস্তব ও সক্রিয় প্রকাশ।

আমাদের ভারতের সৈন্যদের সুনাম আছে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনেই বিদেশী সেনাপতিগণ তাহাদের নেতৃত্ব করিতেন, শিক্ষাদান করিতেন। বর্তমানে ভারতীয় বাহিনীর পরিচালক—শিক্ষক—সবই ভারতীয়। আমরা প্রাদেশিকতা—সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে যে বাঞ্ছিত

ভারতীয়ত্ব তথা জাতীয়তাবোধ বাস্তব হউক বলিয়া কামনা করি, তাহা আমাদের বাহিনীর মধ্যে, জোয়ানদের মধ্যে বাস্তব ও সক্রিয় দেখিয়াছি। ইহা একটি বড় দেখা। আর দেখিলাম, আমাদের জোয়ানগণ দেহ মনে 'প্রস্তুত'। ভারতের ইজ্জত রক্ষার গুরুদায়িত্ব তাহারা বহন করিতেছে, সদাজাগ্রত প্রহরী তাহারা। সীমান্ত রক্ষায় জান্ কবুল করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্বাধীন নবভারতের তীর্থ ত ওইখানেই। আমাদের বাহিনীর জোয়ানগণের নিয়মানুবর্তিতা আমাদের সমাজজীবনে যত অনুসৃত হইবে, জাতি হিসাবে আমরা তত বড় হইব। মনে না করিয়া পারিলাম না যে, আমাদের বাঙালী যুবকগণ কেন আরও শতে সহস্রে দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব লইয়া বাহিনীভুক্ত হয় নাই। প্রকৃত বীরত্বের সঙ্গেই যেন শৃঙ্খলা-সংযম, নম্রতা ও ভদ্রতা মিশান থাকে। সৈন্যবাহিনীতে তাহার প্রমাণ পদে পদে পাইয়াছি।

উধমপুর হইতে ফিরিতে রাত্রি হইল। বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাই বেশ শীত। দুপুরে বেশ গরম ছিল—শীতবস্ত্র তাই সঙ্গে ছিল না। পথের ঝাঁকুনিতেও হইতে পারে—বুকের পাশে একটু ব্যথা বোধ করিতেছিলাম। জীপে কোথায় বসিলে রাস্তার ঠাণ্ডা কম লাগিবে, আমাদের একজন সঙ্গীকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেই বাঙালী অফিসার তাহা শুনিয়া ফেলিলেন। অমনি আমাকে ড্রাইভারের পাশে বসাইলেন এবং 'আসিতেছি' বলিয়াই ছুটিয়া গেলেন এবং তাঁহার গরম ভারী ওভার কোটটি আনিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, দরকার নাই। কিন্তু সৈনিক তাহা শুনিবেন কেন? এমন পরম আগ্রহে ওভারকোটটি দিলেন যে, আমি আর অসম্মত হইতে পারিলাম না। প্রায় ৪০ মাইল রাস্তা আসিতে হইবে। ওভারকোটটি ফেরতই বা দিব কেমন করিয়া, তাহাও ভাবিতেছিলাম। তিনিই বলিলেন, ড্রাইভারের কাছেই দিয়া দিলে চলিবে। আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু শুধু ধন্যবাদ দিবার কথা নয়। যে ভদ্রতা, নম্রতা ও মানবিকতা আমরা কামনা করি, তাহা বাহিনীতে যে কতটা সহজভাবে রহিয়াছে তাহাই উপলব্ধি করিবার। এইরূপ সেবা-নিষ্ঠ

ভদ্র আচরণ সৈন্যবাহিনীতে সর্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছি। পল্লীবাসিগণের মুখেও সৈন্যদের সেবা ও চিকিৎসার প্রশংসা শুনিয়াছি।

ভারতীয় সৈন্যেরা পল্লীবাসীদের চিকিৎসা-সাহায্য দিতেছেন

সীমান্ত পার হইয়া এবং সীজফায়ার লাইন পার হইয়া পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত তথাকথিত 'আজাদ কাশ্মীর' হইতে লোকজন আসে কিনা—প্রশ্ন করিয়াছিলাম। উত্তরে জানিলাম, নানা কারণে আসে। স্মাগলিং একটি কারণ। স্মাগলিংয়ে এপারের দুষ্ট লোকেরও সংস্রব কিছু থাকে। আর এক কারণ ওপারের দুঃখ-দুর্গতি। আবার এপারে কাহারও কাহারও আত্মীয়-স্বজনও রহিয়াছে। বর্তমানে এইরূপ 'আসা' যাহাতে সম্ভব না হয়, সেজন্য কড়া ব্যবস্থা আছে। আর ওপারে থাকিবে না—এমন প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতে চাহিলেও বর্তমানে সহজে অনুমতি দেওয়া হয় না। ইহাই সরকারের বর্তমান নীতি। কারণ এই পথে নূতন ধরনের উদ্বাস্তু-সমস্যা দেখা দিতে পারে। সুদীর্ঘ সীমান্ত ; নদ-নদী পাহাড়-পর্বতসংকুল। কড়া পাহারা সত্ত্বেও কখনো কখনো ওপার হইতে লোক আসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রায় সর্বক্ষেত্রেই

ধরা পড়ে। ঝাঙ্গরের জনৈক সেনানায়ক বলিলেন, ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তেমন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া চোখ বাঁধিয়া ফেলি। উদ্দেশ্য সামরিক ব্যবস্থাদি কিছু দেখিতে ও জানিতে না পারে। এই চোখবাঁধা অবস্থায় ধৃত ব্যক্তিদের নিকটবর্তী জেলার পুলিশ কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হয়। সামরিক দায়িত্ব এইখানেই শেষ। ধৃত ব্যক্তিকে কী করা হইবে তাহা শাসন-কর্তৃপক্ষের বিচার্য। শত্রুর গুপ্তচর হিসাবে কেহ কেহ আসিতে পারে কিনা—এই প্রশ্নও করা হয়। জেনারেল……বলিলেন, একেবারেই অসম্ভব বলিব না; তবে যাহারা আসে তাহাদের অধিকাংশ নিশ্চিতরূপেই কেহ স্মাগলার, কেহ আত্মীয়-স্বজনের নিকট আসিতে চেষ্টা করে, কেহ জীবিকার জন্য—ওপারের দুঃখ-কষ্ট এড়াইবার জন্য আসিতে চেষ্টা করে। তবে কড়া-কড়ি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রহিয়াছে। সীমান্ত বরাবর আমাদের সৈন্যবাহিনী দেখিয়া এই ধারণা লইয়া আসিয়াছি যে, তাহারা যে-কোন হামলা, যে-কোন আক্রমণের সম্মুখীন হইবার জন্য সদা 'প্রস্তুত'। কোন আক্রমণের হুঙ্কারে তাহারা ভীত নহে; সীমান্ত রক্ষায় পর্যাপ্ত শক্তি সমন্বিত হইয়াই তাহারা অবস্থান করিতেছে। সর্বোপরি লক্ষ্য করিয়াছি—তাহাদের বলিষ্ঠ মনোবল এবং ভারতের মর্যাদার প্রতি তাহাদের অনুরাগ, দেশপ্রাণতা।

রোশনী কাশ্মীর

আমরা 'ফেস্টিভ্যাল কাশ্মীর' কাশ্মীর উৎসব বা 'রোশনী কাশ্মীর'-এর সমারোহের সময়টাতেই শ্রীনগরে ছিলাম। কেবল শ্রীনগরের উৎসব বা অনুষ্ঠানের জলুস নয়, কাশ্মীরের ছোট বড় শহরে এবং পল্লীতে মাসব্যাপী জাতীয় উৎসব চলিতেছিল। সর্বত্রই খেলাধূলা, ছাত্রগণের ড্রিল, পল্লীবাসীর নাচ-গান, অভিনয়, কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী, আলোক-সজ্জাদির প্রচুর ব্যবস্থা, সঙ্গীতের জলসা। উৎসবে আলোক-সজ্জার বৈচিত্র্য ও সমারোহ লক্ষ্য করিবার। স্পষ্টই বুঝা যায়, কাশ্মীর সরকার এই উৎসব-আয়োজনে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন। এককালে

কাশ্মীরে এই সময়টাতে (আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে) নাকি 'উৎসব' অনুষ্ঠান হইত। অনেকটা উহারই উন্নততর ব্যাপক আয়োজন এবারে করা হইয়াছে। কাশ্মীরবাসীর পক্ষে এটাই সর্বাধিক উৎকৃষ্ট সময়। ফসল ঘরে উঠিয়া আসিতেছে, শীত পড়ে নাই, আবহাওয়া চমৎকার। উৎসব-ক্ষেত্রে জনসভারও আয়োজন করা হয়। নেতৃবৃন্দ পল্লীর সভাগুলিতেও যোগ দিয়াছেন। অনেক উৎসব সভায় সদর-ই-রিয়াসত (যুবরাজ করণ সিং) এবং প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ যোগ দিয়াছেন, ভাষণ দিয়াছেন। এমনি একটি উৎসব-ক্ষেত্র 'লোলাব' (শ্রীনগর হইতে ৭০ মাইল দূরে) দেখিতে আমরাও যাই। এখানে লোলাবের কথা বলিতেছি।
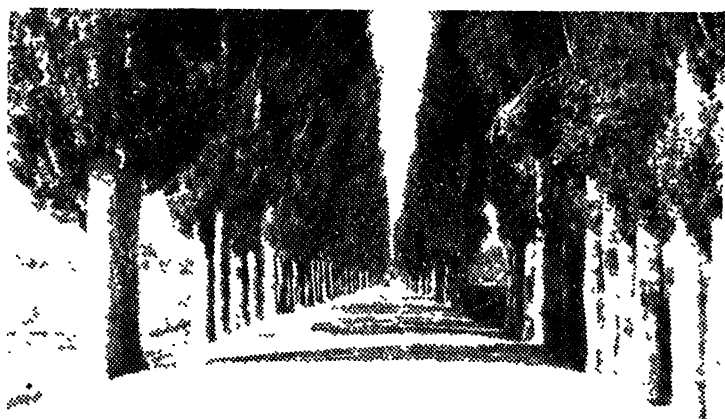
পপ্‌লার বৃক্ষশ্রেণী—কাশ্মীর

আমরা ১৫-১১-৫৬ তারিখে শ্রীনগর হইতে পপলার-শোভিত রাস্তা ধরিয়া লোলাবের দিকে যাত্রা করিলাম। না দেখিলে পপলার গাছের শোভা অনুমান করা যায় না। পথে নদী-পাহাড় শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে চলিলাম। লোলাবে বক্সী গোলাম মহম্মদ ও সদর-ই-রিয়াসত যাইবেন। তাই পথে পথে তোরণ, বিবিধ সজ্জা। মাঝে

মাঝে অপেক্ষমাণ জনতা। পতাকা হস্তে ছাত্রগণও চলিয়াছে। কোথাও অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য লোকজন অপেক্ষা করিয়া আছে। স্থানে স্থানে পল্লীর মেয়েরাও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ বা কিছুটা আড়ালে শিশুক্রোড়ে অপেক্ষা করিতেছে। বাসে যাইবার পথে স্থানে স্থানে পাহাড়-নদী ও শ্যাম-শস্যের শোভা দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের গানটি মনে পড়িতে লাগিল।' শ্রীকমলকুমারই প্রথম আবৃত্তি করিলেন—এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, ইত্যাদি। আমি বলিলাম, 'সুর করে গেয়েই ফেলুন।' কমলকুমার বলিলেন, 'তা হলে আপনিও ধরুন।' বলিলাম, 'বেশ তা গাইব।' আমরা দুইজনে সত্যিই গান ধরিলাম।

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে-যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি!
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার—কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে!
ভায়ের মায়ের এতো স্নেহ কোথা গেলে পাবে কেহ,
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।"

পুরা গানটিই আমরা গাহিলাম। আর মধ্যে মধ্যে ইংরেজী তরজমা করা হইল। আমাদের পার্টিতে বাংলা বুঝেন না এমন সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের এই দেশপ্রেমের সঙ্গীতটির আবেদনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন, বেশ কিছুটা অনুপ্রাণিত হইলেন। 'চমৎকার', 'ভেরি বিউটিফুল' ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ত্রিবান্দ্রমের বিখ্যাত মলয়ালী কবি শ্রী জি. শঙ্কর কুরূপ। তিনি এক একটি কলি শুনিয়া উহা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ বাংলা;

আদতে সংস্কৃত ঘেঁষা ; তিনি সংস্কৃত জানেন, তাই গানের অর্থ অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন। মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু শ্রীতলোয়ারকার এই গানটি সম্পর্কে বলিলেন, দেশপ্রেমের আদর্শ ইত্যাদি। এই গানটি পরে তিনি দেবনাগরী হরফে লিখিয়া নিয়াছিলেন। গানটি তাঁহার শেখাই চাই।

এখানেই প্রসঙ্গত একটি কথা বলিব। শ্রীশঙ্কর কুরূপ, তলোয়ারকর, নবাব আবেদ আলি, শ্রীযুধবীর বাংলা কিছুটা বোঝেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের কোন কোন লেখা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যে-সকল বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তলোয়ারকর তাহারও খবর রাখেন। কবি শঙ্কর কুরূপ বাংলা সাহিত্যের অনেক পুস্তকের তর্জমা ত পড়িয়াছেন-ই, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার সঙ্গেও পরিচিত। ধীরে ধীরে বাংলা বলিয়া গেলে (বিশুদ্ধ বাংলা) বুঝিতে পারেন। আমার একখানা বাংলা পুস্তকের অংশ ধীরে ধীরে পড়িয়া শুনাইলেন। বলিলেন, আমাদের মলয়ালমীর শতকরা ৬০ ভাগ সংস্কৃত, প্রদেশে প্রদেশে উচ্চারণভেদে উচ্চারণ-বৈষম্যেই স্বতন্ত্র মনে হয়। বাংলা কবিতা ও গদ্যাংশের শব্দগুলি ধরিয়া এবং মলয়ালমের ভাষা হইতে শব্দ তুলিয়া বলিলেন, দেখুন মূল একই শব্দ। বাংলা ভাল করিয়া শিখিবার তাঁহার কী আগ্রহ। আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "আমাকে 'আনন্দবাজার' ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইবেন। সংবাদে আমার প্রয়োজন নাই, সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি পড়িতে পাইলেই চলিবে।" তাঁহার আগ্রহে ও অনুরোধে ফিরিয়া তাঁহাকে 'আনন্দবাজার' পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

এখানে নিজের এবং নিজেদের লজ্জার কথা কবুল না করিয়া পারি না। অপর প্রদেশের লোক বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে যাহা জানেন, আমরা সেই তুলনায় কতটুকু জানি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিককে জানিবার আগ্রহের অভাব আমাদের আছে। বিদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে আমরা যতটা জানি, ভারতের অন্য প্রদেশের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে আমরা সে তুলনায় খুব কমই জানি। আমাদের মধ্যে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একটা গৌরববোধ

সঙ্গতভাবেই আছে; একটা শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা আছে। কিন্তু ইহা প্রশংসার কথা নহে যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে আমরা উদাসীন থাকিব। সেখানেও সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টির গৌরব আছে। তাহা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধির জন্যও ভারতের অন্যত্র সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহা জানা প্রয়োজন। গোটা ভারতকে জানিবার পক্ষেও ইহার প্রয়োজন আছে। আমাদের জানিবার কিছু নাই, আমাদের প্রচুর আছে—এমন মনোভাব কল্যাণের নহে। শ্রীশঙ্কর কুরূপ-এর একখানা কবিতা পুস্তকের ইংরেজি তর্জমা পড়িলাম।

* * * *

লোলাবে পৌঁছাইলাম। দূরত্ব শ্রীনগর হইতে ৭০ মাইল। পথে পথে মেলা বসিয়া গিয়াছে। লোক চলিয়াছে—গাড়িতে, ঘোড়ায় পদব্রজে। সুবিস্তৃত এক ময়দানে সামিয়ানা, সভামঞ্চ, বিশিষ্ট অভ্যাগতদের বসিবার আসন। সহস্র সহস্র লোক ময়দানে জমায়েত হইয়াছে, উৎসবের বিবিধ অনুষ্ঠান উপভোগ করিবে। আর বড় আকর্ষণ—বক্সী গোলাম মহম্মদ। বাজনা বাজিতে লাগিল। এবার সদর-ই-রিয়াসত ও বক্সী গোলাম মহম্মদ সত্যই আসিতেছেন। বোধ হয় পোয়াটেক মাইল দূর হইতেই জনতার জন্য তাঁহাদের পথ প্রায় রুদ্ধ। জনতার অভিবাদন নিতে নিতে জনতা সরাইয়া তাঁহারা আসিয়া পৌঁছাইলেন। তাঁহারা মঞ্চে উঠিতেই উঠিল জয়ধ্বনি—'বক্সী সাহেব জিন্দাবাদ' 'নেহরু জিন্দাবাদ'। 'সদর-ই-রিয়াসত জিন্দাবাদ'ও উঠিল। আর শোনা গেল 'কাশ্মীর জিন্দাবাদ'। জনগণের কোন জিন্দাবাদ বা জয়ধ্বনি কতটা স্বতঃস্ফূর্ত, আন্তরিক তাহা ধ্বনি হইতে বুঝা যায়। সমবেত জনতা সর্ব অন্তর দিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে যেমন 'বক্সী সাহেব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়াছে মনে হইল বিরাট জনতার 'নেহরু জিন্দাবাদ' ধ্বনিও অনুরূপ।

সদর-ই-রিয়াসত হিন্দিতে সংক্ষিপ্ত সুন্দর ভাষণ দিলেনঃ উন্নয়ন

প্রয়াসে অংশীদার হও। বক্সী সাহেব কাশ্মীরের জনগণের উদ্দেশে কাশ্মীরী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। জনতার নিকট বক্সী সাহেবের বক্তৃতাভঙ্গি স্বতন্ত্র। তিনি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়া একটু পরেই জনতার একজন হইয়া যান, তাহাদের সঙ্গে যেন ঘরোয়া কথাবার্তা বলিতেছেন এইরূপ মনে হয়। প্রশ্ন করিতেছেন, উত্তর আদায় করিয়া লইতেছেন। "ইহা আমাদের অবশ্য করিতে হইবে। কী বলেন আপনারা, মঞ্জুর?" সহস্র লোকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'মঞ্জুর' 'মঞ্জুর'! বর্তমান সরকার জনগণের দুঃখ অভাব দূর করার জন্য কী কী কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, জনগণের নিজের উন্নতির জন্য নিজেদের আগাইয়া আসিতে হইবে, বক্তৃতায় এসব কথাই বলা হইল। ভারত ও নেহরুর কথা হইলেই জনতা 'নেহরু জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়াছে।

লোলাবের অনুষ্ঠানে কাশ্মীর-উৎসবে আগত লাডাকীরাও সেদিন উপস্থিত হইলেন। মেয়ে-পুরুষ মিলিয়া জন কুড়ি। আমাদের সঙ্গেই তাঁহারা সবাই বসিলেন। চীনা ও তিব্বতীদের মতই অনেকটা। তবে রং অনেকেরই বেশ ফরসা ও রক্তাভ। একটি মহিলাকে বেশ সুন্দরীই বলা যায়, রক্তিম গণ্ড অতি শুভ্র মুখাবয়বকে সুন্দরতর করিয়াছে। ইহাদের ভাষার হরফ দেব-নাগরী। ইঁহারা সকলেই বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। ভারতীয় বৌদ্ধদের মতই অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন (পুরুষ) ইতিপূর্বে দিল্লী ২৷১ বার গিয়াছেন। ইংরেজী জানেন। আমরা কথাবার্তা বলিলাম। জানিলাম ইঁহাদের সামাজিক বিবাহ-প্রথা। একটি মেয়েকে পরিবারের বড় ভাই বিবাহ করে, বধূ করিয়া ঘরে আনে। দ্বিতীয় ভ্রাতা, কোন স্থলে তৃতীয় ভ্রাতাও ঐ মেয়েকেই বিবাহ করে। ভাইয়ের সংখ্যা ইহার বেশী হইলে কনিষ্ঠকে বৌদ্ধ মঠে গিয়া সন্ন্যাসী হইতে হয়। যে কারণে ও যে প্রয়োজনেই হউক, উহাদের সমাজে এই প্রথা দেখা যায়। বহু প্রাচীন এই প্রথা। এখনও ইহার অবসান ঘটে নাই। তবে বর্তমানে স্বাধীনতা লাভের পরে এই প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা চলিতেছে, আইন প্রণয়নের ব্যবস্থাও হইতেছে। অবশ্য এই প্রথা ক্রমেই হ্রাস

পাইতেছে। নূতন জগতের আলো ইহাদের মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। কাশ্মীরের নবজীবন-স্পন্দনের সঙ্গে এই লাডাকীদের জীবনও স্পন্দিত হইতেছে। ইহাদের সকলের জীবন ভারতের বৈচিত্র্যময় জীবন-জাগরণের দ্বারা প্রভাবিত হইতে বাধ্য। ইহাদের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অবশ্যই স্বতন্ত্র, আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হইবে। কিন্তু এই বিচিত্র বিশাল ভারতের অখণ্ড সত্তাকে এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই সত্য করিয়া পাইতে হইবে, তবে না 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' সার্থক হইবে। বুঝিতে হইবে, বাংলার লোক-সঙ্গীত ও কাশ্মীরের লোক-সঙ্গীতে পার্থক্য আছে; কিন্তু উহার দুঃখ-বেদনা আশা-নিরাশা-স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা অনুভূতি এক। অখণ্ডতার এই মর্মটি, ইহার সত্য অস্তিত্বটি ধরিতে হইবে, বুঝিতে হইবে। বিশাল ও বিচিত্র ভারতের এই ঐক্যের সত্তাকে জানিবার জন্যই ভারত ভ্রমণের প্রয়োজন আছে। তাহাই হইবে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে এক ভারতীয়ত্বের সত্য সন্ধান।

উৎসবক্ষেত্র হইতে—উৎসবের প্রোগ্রাম দীর্ঘ—আমরা লোলাবেরই একজন এম. এল. এ.-র বাড়ি মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য গেলাম। উৎসব-ক্ষেত্র হইতে বাড়ি বেশ খানিকটা দূর। গাড়িতেই গেলাম। মধ্যে মধ্যে রাস্তায় জল-কাদা ছিল। কোন পার্বত্য নদীর ক্ষীণধারা বহিয়া গিয়া জলসিক্ত করিয়াছে। গাড়ি যাওয়ার অসুবিধা। অনেকে হাঁটিয়া গেলেন। পল্লী অঞ্চলের বাড়ি। দোতলায় আমরা উঠিয়া গেলাম। একটি ঘরে আমরা—আমাদের সঙ্গে কাশ্মীরের সাংবাদিক বন্ধুও দুইজন ছিলেন, একজন ইংরেজ পর্যটকও ছিলেন—আহারে বসিলাম। প্রথামত ফরাসে। লোলাবের উৎসবে সমাগত বহু ব্যক্তিকেই গৃহস্বামী নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন দেখা গেল। মনে হইল যেন এক যজ্ঞিবাড়ি। আহার-ব্যবস্থা ভালই। কিন্তু পরিবেষণ-ব্যবস্থা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভড়কাইয়া গেলাম। পংক্তিভোজনে প্লেটে ভাত দেওয়া হইতেছে। জল দেওয়া হইতেছে। এই সময় একজন লোকের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সহসা মনে হইল, কোন বহুরূপী বা কোন পাগল নয় ত? মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলাম, ইনি বাবুর্চি-ঠাকুর: আলখাল্লার

মত জামা, তৈল-ঘি ও রান্নার মশল্লায় মণ্ডিত। পেটে মাংসের হাঁড়ি গাছ-কোমর করিয়া বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা। বস্ত্রের রং অয়েল ক্লথের মত। স্কন্ধদেশেও অনুরূপ বস্ত্রখণ্ড। তিনি হাণ্ডি হইতে হাতায় মাংস তুলিয়া পরিবেষণ করিতেছেন। একটা যজ্ঞিবাড়ির রসুইশালায় ভোর হইতে ২টা পর্যন্ত রন্ধনকার্যে লিপ্ত থাকায় জামা ও ঝাড়ন-বস্ত্রের যে হাল হইয়া থাকে—ঠিক সেই হালেই পরিবেষক আসিয়াছেন। কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজনবোধ তিনিও করেন নাই,—মনে হয় এঁরাও করেন না। অর্থাৎ বাবুর্চি-ঠাকুরের যে হাল হইয়াছে, ঘর্মাক্ত কলেবরে, সেই হালেই পরিবেষণে আসিয়াছেন। রসুইখানায় বাবুর্চিদল যে হালেই থাকুক, খাওয়ার টেবিলে যাহারা পরিবেষণে আসিবে, তাহারা তকমা আঁটিয়া না আসুক, ধোপদুরস্ত জামা পরিয়া পরিবেষণ করিবে, ইহাই সকলে চায়। একেবারে রন্ধনশালা হইতে হলুদ-লঙ্কা-তেল-কালিঝুলি মাখিয়া আসিয়া পাচকঠাকুর পরিবেষণ করিতে আরম্ভ করিলে আমাদের ভাল লাগে না। অন্যদেরও না লাগিবারই কথা। কিন্তু গৃহস্বামীর আয়োজন, আন্তরিকতা কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তথাপি কাশ্মীরের সাধারণ ভোজনব্যবস্থার একটি চিত্র হিসাবে ইহার উল্লেখ করিলাম। বোধ হয় পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কিছুটা ঔদাসীন্য আছে। বাড়ির বাহিরে আসিতে দেখা গেল, বাড়ির গা ঘেঁষিয়া একটি নর্দমার মত রহিয়াছে। হয়ত কোন পর্বতের ঝরনার সামান্য ক্ষীণ জলধারা। তেমন স্রোত নয় যে, আবর্জনা পড়িলে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। দেখিলাম, উহারই জলে প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি ধোওয়া হইতেছে। কাশ্মীরের খানার খ্যাতি আছে; বহু উপকরণে সুসমৃদ্ধ। এক রাত্রে ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের জেনারেল সেক্রেটারির ডিনার নিমন্ত্রণ ছিল। চেসমিবাগের বিখ্যাত ঝরনার (বলে রয়াল স্প্রিং) ধারে প্রকাণ্ড লনে 'কাশ্মীরী খানার' ব্যবস্থা ছিল। গুণিয়া দেখিলাম মাংসের ৯ প্রকারের রান্না হইয়াছে। কাশ্মীরের বিখ্যাত ও বিশিষ্ট উঁচু থালিয়া, ঢালাই করা বাটি। নীচে গরম জল রাখার ব্যবস্থা। সেখানকার পরিবেষণব্যবস্থা সবই পরিচ্ছন্ন। কাশ্মীরীরা

আমাদের বাঙালীর মতই ভেতো, ভাত খাইয়া থাকেন। অবশ্য ভাত-রুটি দুই-ই ছিল। প্রায় একশত লোক এক ফরাসে বসিয়া আমরা নৈশ-ভোজন করিলাম। হাত-মুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থাদিও নিখুঁত।

বান্দীপুর পল্লী-উৎসবে বক্সী সাহেব সহ সাংবাদিকবৃন্দ

কাশ্মীরের উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ও পল্লীবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে আমরা বান্দীপুরও গিয়াছিলাম। রাত্রি হইল।

বক্সী গোলাম মহম্মদ ছিলেন। বক্সী-সাহেবের সঙ্গে আমরা উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করিলাম। 'ছক্রি' শুনিলাম, পল্লী-গীতি।

পল্লীর লোকের দ্বারা বিভিন্ন কৌতুকাভিনয়ও হইল। শহুরে ও পল্লীর লোকের ক্যারিকেচার একটা হইল। 'পল্লীর বিবাহ' দেখা গেল। বর আসিলেন, কনে আসিলেন। কনের সঙ্গিনীরা আসিল, বরের সাথীরাও আসিল। বিবাহের পরে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার পূর্বে মা উপদেশ দিতেছেন—জামাইয়ের ঘর কেমন করিয়া করিতে হইবে, ইত্যাদি। এবার বর ঘোড়ায় চড়িয়া বধূ লইয়া (বধূ তঞ্জামে যাইবে) বাড়ি যাইবে। নববধূ তঞ্জামে উঠিল। বর ঘোড়া হইতে নামিয়া মঞ্চে বক্সী-সাহেবকে সেলাম দিতে আসিতেই বক্সী-সাহেব তাঁহার মালাটি বরকে উপহার দিলেন। দর্শকদের (আমাদেরও) কী আনন্দ! বক্সী-সাহেব ২।১ বার জনতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য মঞ্চ হইতে নামিয়া গেলেন। কিভাবে শৃঙ্খলার সহিত বসিতে হয়, তাহা সমঝাইয়া দিলেন। সহসা বক্সী-সাহেবের ইচ্ছা হইল —আমাদের প্রেস পার্টির সঙ্গে টাগ্ অব্ ওয়ার হউক। প্রোগ্রামে টাগ্ অব্ ওয়ারও ছিল। আমাদের প্রেস পার্টির ১৩ জন আর স্থানীয় লোক ১৩ জন দাঁড়াইয়া গেলেন। মঞ্চে থাকিলাম আমি, কবি শঙ্কর কুরূপ এবং মিসেস তলোয়ার খান। বক্সী সাহেব স্টার্টার। আমাদের মধ্যে অগ্নিহোত্রী, যুধবীর প্রভৃতি জন কয় বেশ বলবান। ও পক্ষের দৈহিক পরিধিও কম ছিল না। কিন্তু টাগ্ অব্ ওয়ারে আমাদের প্রেস পার্টির জয় হইল। কমলকুমার আসিয়া বলিলেন, দেখলেন দাদা, আমাদেরই জয় হ'ল! আমি বলিলাম, হ'তেই হবে। আমি ও মিসেস তলোয়ার খান আর কবি এখান হতে কি রকম উইল ফোর্স প্রয়োগ করেছি।

পরে যেদিন বক্সী-সাহেবের টি-পার্টিতে (বহু লোক নিমন্ত্রিত ছিলেন) আমরা যাই, সেদিন আমাদের দেখিয়াই বক্সী-সাহেব বলিয়া উঠেন, আজ আবার টাগ্ অব্ ওয়ার হউক। অবশ্য আর দড়ি-

টানাটানি হয় নাই। একবার জিতিয়াছি, সেটাই বহাল থাকা ভাল।

কাশ্মীর উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা গিয়াছি। 'প্রদর্শনী' কেবল কাশ্মীরের বহু প্রকারের কুটির-শিল্পেরই নহে, বর্তমান বিবিধ শিল্পোদ্যমের প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কৃষি, পশুপালন ইত্যাদির প্রদর্শনী বেশ শিক্ষামূলক। শিক্ষাব্যবস্থার এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিপত্রের সংগ্রহসমূহের প্রদর্শনী অতি মূল্যবান। কাশ্মীর উৎসবের উদ্যোগ আয়োজনে, আনন্দ পরিবেষণে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কাশ্মীরের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় এত অর্থব্যয় উচিত কি না, এই প্রশ্ন ওঠে। এই প্রশ্নও আমরা করিয়াছি। এই উৎসব-আয়োজনের উদ্দেশ্য কী—এই প্রশ্নের উত্তরে বক্‌সী-সাহেব খোলা উত্তর দিলেন, "কাশ্মীরবাসীর অর্থাগমের জন্য, তাহাদের স্বার্থের জন্যই। কাশ্মীরে ট্যুরিস্ট-আগমন বৃদ্ধি পাক—উৎসবের ইহা একটি উদ্দেশ্য। এই ধরুন, আপনাদেরই কথা। যদিও আপনারা অতিথি, তাহা সত্ত্বেও আমি জানি, আপনারাও কাশ্মীরে আসিয়া বেশ কিছু অর্থব্যয় করিবেনই, আপনারাও কাশ্মীরের বহু জিনিস ক্রয় করিবেন।" কথাটা আদৌ মিথ্যা নহে। তথাপি কাশ্মীর উৎসবের এই সমারোহে ব্যয়াধিক্যকে শ্রীনগরের সরকারের বিরোধী পক্ষ কেহ কেহ সমালোচনা করিয়াছেন।

বান্দীপুরেই একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন, নাম নাদাম। ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন। এই কবির খুব সম্মান। তাঁহার রচিত কবিতা আবৃত্তি করা হইল। আর একজন কবি তাঁহার স্বরচিত কবিতা সুর করিয়া গাহিলেন। কবির চেহারার সঙ্গে আমাদের কবি নজরুল ইসলামের যৌবনকালের চেহারার সাদৃশ্য আছে। তিনিও যথেষ্ট জনপ্রিয় দেখিলাম। বিভিন্ন উৎসব-ক্ষেত্রেই তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার গানের মর্ম—কাশ্মীর আমার প্রিয়; উঁচু পাহাড়-ঘেরা এই কাশ্মীর—কার সাধ্য কাশ্মীরে হানা দিতে আসে—ইত্যাদি।

যুবরাজের সঙ্গে

সদর-ই-রিয়াসত যুবরাজ করন সিং আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। ১৮।৯।'৫৬ তারিখে আমরা সবাই গেলাম। সকলেই কোট-প্যাণ্ট, নেকটাই নিলেন। শুধু আমি ধুতিচাদর! রাজপ্রাসাদটি খুব বড় বা জমকালো নহে। কিন্তু চমৎকার পরিবেশ। একদিকে সুউচ্চ পর্বতমালা, অপরদিকে ডাল লেক ও অদূরে পাহাড়। ফুল, গাছপালা, লতাপাতায় ঘেরা লনে আমরা বসিয়া গেলাম। যুবরাজ আসিয়া সকলের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। চায়ের সঙ্গে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

যুবরাজ যুবক—কিন্তু সুশিক্ষিত, বহু বিষয়ের সংবাদাদি রাখেন। কাশ্মীরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে কথাবার্তা হইল। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, কাশ্মীরের আর এক নাম সারদাপীঠ। সারদা—অর্থ বিদ্যাদেবী। বস্তুত কাশ্মীরে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার গৌরব ছিল; ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে অনেক শিক্ষার্থী এখানে আসিতেন। যুবরাজ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী মনে হইল। অমরনাথ তীর্থে গিয়াছেন। আমাদের বলিলেন, "আপনারা অসময়ে আসিয়াছেন; এখন অমরনাথে বরফ। নহিলে দেখিয়া যাইতে পারিতেন।"

দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র সম্পর্কে কথা উঠিল। কাশ্মীরের দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রসঙ্গে জানা গেল, জম্মু-কাশ্মীরে খান ৪০ সংবাদপত্র আছে। ইহাও জানা গেল, এমন দৈনিকও আছে যাহার চার মাস পরে এক সংখ্যা বাহির হয়। কোন বিশেষ উপলক্ষে দৈনিক বাহির হয়, আবার উপলক্ষের অবসানে প্রকাশ স্থগিত থাকে। সংবাদপত্রের অবস্থা ভাল নহে, কারণ পাঠক-সংখ্যা অতি সামান্য। যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা ইংরেজী কাগজই পড়েন। যুবরাজ কথাপ্রসঙ্গে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রচার অন্যত্র কিরূপ, ভারতে সর্বাধিক প্রচার কোন্ কাগজের ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাদের পার্টির কেহ কেহ বলিলেন, দেশীয় ভাষায় বাংলা সংবাদপত্রের প্রচারই অধিক।

যুবরাজ করন সিংহের সহিত কাশ্মীর-পরিক্রমারত সাংবাদিকবৃন্দ। দণ্ডায়মান (বাম হইতে দক্ষিণে)—শ্রী কমলকুমার (ভারত গভর্ণমেন্টের পি-আর-ও), শ্রী জি. ডি. শর্মা (জম্মু-কাশ্মীর সরকারের প্রিন্সিপাল ইনফরমেশন অফিসার), কবি জি. শঙ্কর কুরুপ (ত্রিবান্দ্রম), নবাব আবেদ আলি খান (সিয়াসত হায়দরাবাদ), শ্রী বলবন্তী শাহ (গুজরাট সমাচার, আমেদাবাদ), শ্রী টি. ই. নিবাস রাও (আনন্দ নিকেতন, মাদ্রাজ), শ্রী পি.আর. বেঙ্কটেশ (দি তাইনাডু, বাঙ্গালোর), যুবরাজ করন সিং, মিসেস তালেয়ারখান, শ্রী জি.এস. তালোয়ারকর (লোকদত্ত, বোম্বাই)। উপবিষ্ট (বাম হইতে দক্ষিণে—শ্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য (ভারত গভর্ণমেন্টের আর্টিষ্ট), মেজর পুরী (সামরিক বিভাগীয় পি-আর-ও), শ্রী আর. পি. অগ্নিহোত্রী (ভারত সরকারের সহকারী পি-আর-ও), মিঃ আমিন (কাশ্মীর সরকারের পি-আর-ও) এবং সর্বদক্ষিণে দণ্ডায়মান লেখক।

সংখ্যা কত? এই প্রশ্নের উত্তর আমাকেই দিতে হইল। সংখ্যার কথা শুনিয়া যুবরাজ কিছু বিস্মিত হইলেন। দেশীয় অর্থাৎ প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত কাগজের প্রচার-সংখ্যা এত অধিক হইতে পারে, এই ধারণা তাঁহার ছিল না।

নানা বিষয়ের আলোচনার মধ্যে বর্তমান শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে কথা উঠিল। ২।৩ বৎসর পূর্বেও শিক্ষার হার যাহা ছিল, বর্তমানে তাহার তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট শিক্ষা-বিস্তারকল্পে জম্মু-কাশ্মীরের সর্বত্র সর্বস্তরে শিক্ষাদান অবৈতনিক করিয়াছেন। তবে বাধ্যতামূলক (প্রাথমিক ক্ষেত্রেও নয়) করা হয় নাই। বাধ্যতামূলক করা হয় নাই এইজন্য যে, শিক্ষাব্যাপারে কাশ্মীর এতই পশ্চাৎপদ যে, বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা পীড়ন মনে হইতে পারিত। তবে বর্তমানে শিক্ষার প্রতি শহর ও পল্লীতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা দিয়াছে। প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য চাহিদা বাড়িয়াছে। এমন কি, স্ত্রী-শিক্ষার জন্যও চাহিদা দেখা দিয়াছে। শিক্ষা সম্পর্কে জনগণের পূর্বেকার ঔদাসীন্য বর্তমানে আর নাই; বিদ্যালয়ে ছেলে, এমনকি, মেয়ে পাঠাইবার জন্যও একটা উল্লেখযোগ্য সাড়া পড়িয়াছে। তবে চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট উপযুক্ত শিক্ষক আছে কি না, শিক্ষা-বিভাগের জনৈক ব্যক্তিকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে। কিন্তু সেই অসুবিধা অতিক্রান্ত হইতেছে। শিক্ষক তৈরিরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

যুবরাজ ইহাও বলিলেন, কাশ্মীরের বর্তমান ভাষা একটা মিশ্র-ভাষা। সংস্কৃত, প্রাকৃত, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, ডগ্‌রী ইত্যাদির মিশ্রণ ঘটিয়াছে। মুসলমান অধিকারের পূর্বে সংস্কৃতই ছিল কাশ্মীরের লোকের ভাষা। বলিলেন "ধরুন, শ্রীশঙ্করাচার্য যখন কাশ্মীরে আসেন, তখন তিনি এখানে যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই দেব-ভাষায়।" ডাল লেকের পাড়ে হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শঙ্করাচার্যের মন্দির আমরা দেখিয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি যুবরাজের বিশেষ আকর্ষণ। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে বলিলেন, "শান্তিনিকেতনের লোক এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিলেন। বেশ উপভোগ্য।" বাংলা দেশের কীর্তনের নাম শুনিয়াছেন। কাশ্মীর সম্পর্কে অনেক কাহিনীও শোনা গেল। কাশ্মীরকে 'সতীসর'ও বলা হয়। সর অর্থে সরোবর—সতী-সরোবর। সতী (ভগবতী) তপস্যায় তুষ্ট হন,—দেখা দেয় প্রচণ্ড ভূমিকম্প। ফলে বারমুলার দুর্ভেদ্য পর্বত ফাটিয়া যায়—মুক্ত-ধারায় বহিয়া আসে ঝিলম বা বিতস্তা। মরুভূমির মত ছিল যে কাশ্মীর, তাহাই জলে প্লাবিত হইয়া যায়। এত যে হ্রদ, তাহার হেতু নাকি ইহাই। তবে পুরাণের ভগীরথের মত কাশ্মীরে হিন্দু আমলে একজন সেচ-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তাঁহার নাম সূর্য। কল্‌হনের রাজতরঙ্গিণীতে তাঁহার নামোল্লেখ ও কীর্তিকর্মের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

জম্মু-কাশ্মীর দেখিবার জন্য বাহির হইয়াই মনে হইয়াছিল, কাশ্মীর সীমান্ত রক্ষায় আমাদের সামরিক বিধিব্যবস্থা দেখিব। ইহা ছাড়া, কাশ্মীরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই অর্থ কাশ্মীরের উন্নয়নকল্পে কিভাবে কতটা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাও দেখিতে হইবে। বর্তমানে কাশ্মীরের জনসাধারণের অর্থ-নৈতিক জীবন কিরূপ তাহার পরিচয়ও লইতে হইবে। পরে শ্রীনগর হইতে বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরিয়া জনগণের সঙ্গে যতটা সম্ভব মিশিয়া তাহাও জানিতে অনেকটা সক্ষম হইয়াছি। সংক্ষেপে তাহাও উল্লেখ করিব। কাশ্মীরের রাজনৈতিক অবস্থা মোটামুটি জানিবার বুঝিবারও সুযোগ পাইয়াছি। তাহাও সংক্ষেপে বলিব।

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যশোভা লইয়া বিদেশী ও দেশী বহু পর্যটক, বহু কবি-সাহিত্যিক, বহু শিল্পী পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন। সেই সৌন্দর্যশোভা বর্ণনার চেষ্টা আমি করিব না। বহু যোগ্য ব্যক্তির দ্বারাই তাহা গ্রথিত হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরুর বর্ণনায় কাশ্মীরের সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁহার একটি

অনবদ্য অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলেন, এখানকার সৌন্দর্যের এমনই মহিমা আছে, যে তাহা শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিতেই হয়। এই সৌন্দর্য দেখিলে মানুষের অন্য কোনও দৈহিক অনুভূতি থাকে না।

কাশ্মীরী নারীরও সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে। অভিজাত সমাজের কথা থাকুক, সাধারণের মধ্যেও আছে। কৃষিকার্যে রত রৌদ্রতাপক্লিষ্ট কিন্তু প্রকৃত সুন্দরী মধ্যে মধ্যেই দেখা গিয়াছে। বারমুলা হইতে ফিরিবার পথে সাপুর শহরের রাস্তায় আমরা গাড়ি থামাইলাম, রেস্তোরাঁয় চা খাইব। ঐখানেই একটি কিশোরী আপেল-ওয়ালীকে দেখিলাম। দোকানে আপেল সাজাইয়া বসিয়া আছে। কী করুণমধুর সুষমাভরা মুখশ্রী, কী রং, কী অপূর্ব শোভা! এ শুধু বিস্মিত হইয়া দেখিবার। কিন্তু যুগে যুগে কত পাষণ্ড কীচক এই সৌন্দর্যকে উপ-ভোগের কামনায় লাঞ্ছিত করিয়াছে। নারী-দেহের সৌন্দর্যের মতই কাশ্মীরের সৌন্দর্যশোভা, কাশ্মীর শিল্পীর শিল্প-মহিমা, অপূর্ব স্থাপত্যের নিদর্শন, মন্দির, সংঘারাম বিদেশীর ও বিধর্মীর বর্বর আক্রমণে বিধ্বস্ত-ভগ্ন ও লুণ্ঠিত হইয়াছে।

রেডিও কাশ্মীর

আমাদের 'রেডিও কাশ্মীর' চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। স্টেশন-ডিরেক্টর বাঙালী শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জি আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন, পরিচিত হইলাম। তাঁহার অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে চায়ে অনেক শিল্পী নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। প্রচুর খাওয়াইলেন—মায় পানতুয়া, রসগোল্লা। কাশ্মীরী সঙ্গীতের আসর বসিল।

কাশ্মীরের সঙ্গীত সম্পর্কে লোকের মুখে প্রশংসা শুনি নাই, বলে বিষাদের গান। ঐখানেই একখানা ত্রৈমাসিক পত্রে (মার্গ) কাশ্মীরের লোকসঙ্গীত বিষয়ক একটি প্রবন্ধের উপর চোখ পড়িল। , লেখক মিঃ আইমা।

প্রাচীন কিন্তু স্বাধীন কাশ্মীরে নিজস্ব সঙ্গীত ছিল। কাশ্মীরের বহু কিছুর মতই সঙ্গীতও মার খাইয়াছে।

দীর্ঘদিনের পরাধীনতা, নির্যাতন, অন্তহীন দুঃখ-দারিদ্র্য ও হতাশার পরিবেশে কাশ্মীরের সঙ্গীত যেন স্তব্ধ হইয়া যায়। যদি বা কিছু থাকে, তাহা হতাশারই সুর। অথচ কাশ্মীরের নিজস্ব সঙ্গীতের ধারা ছিল। কল্‌হণ তাঁহার রাজতরঙ্গিণীতে কাশ্মীরের প্রায় দুই সহস্র বৎসরের রাজাদের কাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন। শুধ্ রাজাদের ইতিহাস, বা কাহিনী নয়, কাশ্মীরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। খ্রীষ্টজন্মের দুইশত বৎসর পূর্বে কাশ্মীর রাজাদের সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় জানা যায়। মহারাজ জালোকের রাজদরবারে একশত সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। বিখ্যাত সম্রাট মহারাজ ললিতাদিত্যও (৬ শত খ্রীঃ) সঙ্গীতের উৎসাহদাতা ছিলেন। ইন্দ্রপ্রভা নাম্না বিখ্যাত রাজনর্তকী ছিলেন ললিতাদিত্যের সভায়। রাজা হর্ষদেব ও জয়দেব দুইজনেই বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। পরে মুসলমান সুলতানদের শাসনকালে কাশ্মীরী সঙ্গীত নূতনভাবে পুষ্টি লাভ করে। বিভিন্ন বৈদেশিক শাসনকালে মিশ্রণ ও রূপান্তর ঘটে। ইরান, আরব, সমরখন্দ ও তাসখন্দের সঙ্গীতের প্রভাবও আসিয়া পড়ে। সুবিখ্যাত সুলতান জয়নুল আবেদীনের সময়ে (১৪২০-১৪৭০) কাশ্মীর-সঙ্গীতের বিশেষ সুদিন। তিনি বিশেষ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। জয়নুল আবেদীনকে কাশ্মীরের আকবর বাদশাহ বলা হয়। তিনি প্রতি বৎসর কাশ্মীরে সঙ্গীত-সম্মেলন আহ্বান করিতেন। তাহাতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন সমরখন্দ, তাসখন্দ, পাঞ্জাব ও দিল্লীর বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের। প্রকাশ, সম্মেলনে আমন্ত্রিত ভারতীয় একজন তাঁহাকে 'সঙ্গীত-চূড়ামণি' সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থ উপহার দেন। জয়নুল আবেদীনের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিল।

ইহার পর চক্ রাজবংশের (মুসলমান) রাজত্বকাল। এই বংশের কোন কোন রাজারও সঙ্গীতানুরাগের খ্যাতি আছে। এই রাজকুলেরই এক বিখ্যাত রানী হাব্বাব খাতুন ছিলেন কবি এবং সংগীতজ্ঞা। এই চক্ রাজবংশের পতনের পরে আর রাজদরবারের আনুকূল্য থাকে না, কাশ্মীরে সঙ্গীতের মৃত্যু ঘটিতে থাকে। অবশ্য কাশ্মীরের জনগণ

নিজেরা সাধ্যমত তাঁহাদের নিজস্ব সঙ্গীতের ধারা রক্ষা করেন নাই, তাহা নহে। ব্যক্তিগত শক্তিতে কেহ কেহ, ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হইলেও, প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন দেখা যায়। কিন্তু তখন কাশ্মীরী সঙ্গীতে হতাশার সুরই প্রধান। সঙ্গীত বুঝি সকল দেশেই অনুকূল পরিবেশে বিশেষ ভাবে গড়িয়া ওঠে। ইহার অভাবে বা প্রতিকূল অবস্থায় সঙ্গীত উৎকর্ষ লাভ করে না।

বর্তমানে কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট কাশ্মীরী সঙ্গীতকে নূতন জীবনলাভের প্রেরণা দিতেছেন। পল্লী-সঙ্গীতও আজ আর অবজ্ঞাত নয়। বেশ উৎসাহই দেওয়া হইতেছে।

রেডিও কাশ্মীরের সঙ্গীতের আসরে অনেক শিল্পীর সমাবেশ হইল। কাশ্মীরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নাম 'সুফিয়ানী কালাম'। শ্রীনগরের খ্যাতনাম্নী গায়িকা রাসবেগম আমাদের প্রথমে একটি সুফিয়ানী কালাম শুনাইলেন। সঙ্গে ছিল রবাব (রবাব নাকি আফগানিস্তান হইতে নেওয়া হইয়াছে), সারেঙ্গী, সেতার, তবলা। সেতার ভারতে প্রচলিত সেতার হইতে অনেক সরু। দেখিতেও তেমন সুন্দর নয়।
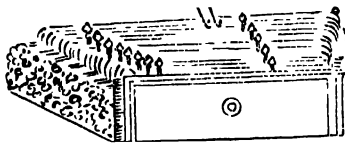
সন্তুর যন্ত্র

মিউজিক ডিরেক্টর কাশ্মীরী মুসলমান। তিনি যন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করিলেন। একটি তারযন্ত্র আসিল, কতকটা বাক্সেরই মত—নাম সন্তুর (Santoor)। বলিলেন, পারস্যে এইরূপ তারযন্ত্র ছিল। ভারতের 'শত-তন্ত্রী' যন্ত্রের নাম হইতে 'সন্তুর' আসিয়াও থাকিতে পারে। সন্তুরেও একশত তার আছে। একজন ওস্তাদ দুই গাছা লোহার কাঠি দিয়া দুই হাতে বাজাইলেন। রাসবেগম আর একটি গান গাহিলেন ভারতীয় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, কিন্তু কাশ্মীরী ঢং মিশাইয়া। মিউজিক্

ডিরেক্টর বলিলেন, কাশ্মীরে তাঁহারা এইভাবে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন।

আরও দুইটি মেয়ে পল্লী-সঙ্গীত 'ছক্‌রি' গাহিলেন। পর্দার আড়ালে নহে, তবে কাশ্মীরী পরিচ্ছদে সর্বদেহ আবৃত—মুখ খোলা। তাঁহাদের সঙ্গে রাসবেগমও গাহিলেন। প্রচলিত মাটির ঘড়া, রবাব, সারেঙ্গী বাজিল। মিউজিক ডিরেক্টর গানের অর্থ বুঝাইয়া বলিলেন প্রেম-সঙ্গীত। আমাদের মনে হইল কতকটা ছড়াগোছের গান। কণ্ঠস্বর মিষ্ট, সুর ও আবেদন করুণ। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ভারত গভর্নমেণ্টের চিত্রশিল্পী জ্যোতি ভট্টাচার্য। রাসবেগম বসিয়া, এক হাঁটু ভাঙ্গিয়া গালে হাত দিয়া যেভাবে গাহিতেছিলেন এবং অপর দুই বেগম যেরূপ ভঙ্গিতে গাহিতেছিলেন তিনি সেই ভঙ্গিতেই তাঁহাদের স্কেচ্ আঁকিয়া নিলেন। যে-সকল ওস্তাদ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছিলেন, তাঁহাদেরও স্কেচ্ নিলেন। সঙ্গীতের আসর ভাঙিবার পরে আমরা সব নীচে আসিয়াছি। বেগমরাও নামিয়া একদিকে বসিয়াছেন। শ্রীঅগ্নিহোত্রী শিল্পীর স্কেচ্ কয়টি বেগমদের দেখাইলেন। রাসবেগমের একখানা একক বড় স্কেচ্ ছিল। বসিবার, গালে হাত দিয়া গাহিবার রকম এবং মুখাবয়ব অবিকল দেখিয়া তাঁহারা খুব খুশী ও বিস্মিত হইলেন। তবে ওস্তাদদের স্কেচ্ দেখিয়া অনেকটা কৌতুকবোধ করিলেন।

স্থানীয় একজন কবি—সঙ্গীত রচয়িতা—নিমন্ত্রিত ছিলেন। আলাপ হইল। কলিকাতায় আসা-যাওয়া আছে বলিলেন। ইংরেজীও জানেন। বলিলেন, কাশ্মীরী সঙ্গীতের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। তাহারই উন্নতি-সাধনের এবং জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা বর্তমানে চলিতেছে ইহাও বলিলেন। স্পষ্ট বুঝা গেল, বহুদিন ধরিয়া নানা কারণে কাশ্মীরী ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সঙ্গীত উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইতেছিল ; বর্তমানে এই সকল ক্ষেত্রে সরকারের এবং কাশ্মীরবাসীর প্রশংসনীয় উদ্যম দেখা দিয়াছে। কাশ্মীরের সঙ্গীত 'সুফিয়ানী কালাম'ও গুরুপরম্পরায়, ব্যক্তি হইতে ব্যক্তিতে অনুশীলিত হইয়া আসিয়াছে। স্বরলিপি লিখিত হয় নাই।

সে-কারণে অসুবিধা থাকা স্বাভাবিক। তাহা সত্ত্বেও গুরুর অনুসরণেরও মোটামুটি ধারা অব্যাহত আছে ইহাও শুনিলাম।

প্রদর্শনীর এক সঙ্গীত-জলসায়ও আমরা উপস্থিত ছিলাম। একজন পাঞ্জাবী ওস্তাদ গাহিলেন। তাঁহার চেহারা এবং পোষাক এমনই জমকালো যে, না বুঝিয়াও বাহবা দিতেই হয়। তিনি গজল গাহিলেন—একটি পাঞ্জাবী লোকসঙ্গীত গাহিলেন। পুনঃ পুনঃ করতালি পাইতে লাগিলেন। সেইখানেই একজন বিখ্যাত ওস্তাদ 'সন্তুর' বাজাইলেন। কোথায় কোথায় সত্যকার কৃতিত্ব তাহা সবটা বুঝি নাই; কিন্তু শুনিতে ভাল লাগিল। ইচ্ছা হইল, আরও শুনি।

কাশ্মীরের অর্থনৈতিক প্রয়াস

এবারে কাশ্মীরের অর্থনৈতিক দিকের পরিচয় লইব।

মনে রাখিবার—কাশ্মীরের আয়তন ৯২৭৮০ বর্গ মাইল। আর লোকসংখ্যা ৪৪ লক্ষ। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩৩২৭৯ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৬০ হাজার। বাংলার কথা ছাড়িয়া দিলেও (বাংলাকে ব্যতিক্রম বলিতে পারেন), বিহারের আয়তন ৬৮৮৩০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩০ হাজার। কাশ্মীরের আয়তন বিপুল। কিন্তু তুলনায় লোকসংখ্যা কতই না কম! চাষবাসের অনুকূল স্থানের পরিমাণ অল্প বলিয়াই ঘনবসতি সম্ভব হয় নাই। নানা প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধা ও বিপর্যয়ে কাশ্মীরের লোক অন্যত্রও চলিয়া গিয়াছে।

কাশ্মীরবাসীর জীবিকার্জনের সময় সংকীর্ণ, মাত্র কয়েক মাস। অর্থনৈতিক দুঃখের ইহা একটি হেতু।

আমরা হাউস-বোট হইতে শিকারায় বাঁধের ঘাটে আসিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম এক সাহেব ও এক মেম, এই দুইজন আরোহী লইয়া একখানা ট্যাক্সি আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে ও বাঁয়ে দুই তিনজন সাইকেল লইয়া ছুটিতেছে; একটি লোক ট্যাক্সির পাদানিতে উঠিয়া পড়িয়াছে। বিদেশী সাহেব-মেম অবাক। এরা টুরিস্ট। যেন গয়ার

পাণ্ডাদের পাল্লায় পড়িয়াছেন। ট্যাক্সি আমাদের সম্মুখেই থামিল। সাহেব কোথায় থাকিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। সাইকেলে যাহারা আসিতেছিল, যে পাদানিতে উঠিয়াছিল, তাহারা হাউস-বোটের মালিক বা দালাল। তাহাদের চোখে-মুখে ক্লান্তি ও উত্তেজনা। শ্বেতাঙ্গ-দম্পতির অবস্থা দেখিয়া আমাদের একজন বলিলেন, আপনারা টুরিস্ট-অফিসে যান, সেখানে সব রকম সাহায্য পাইবেন। তাঁহারা ট্যাক্সি লইয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষুধার্ত জন্তর মুখ হইতে যেন কেহ গ্রাস্ কাড়িয়া লইল। তিন চারজন হাউস-বোটের লোক মর্মাহত হইয়া আমাদেরই কাছে তাহাদের অভিযোগ মর্মান্তিক বেদনার সহিত বলিতে লাগিল। ইহারা ইংরাজী বলিতে পারে। একজন বেশ খানিকটা উত্তেজিতভাবে বলিয়া চলিল, 'আমরা না খাইয়া মরিতে বসিয়াছি। কুকুরের মত লোকের পিছু পিছু ছুটিতেছি।' আমরা বলিলাম, 'বিদেশী লোক আসিলে আপনারা এইরকম কাড়াকাড়ি করিবেন, নিজেরা কলহ মারামারি করিবেন, ইহা ঠিক নহে। আপনাদের ত সমিতি আছে, লিস্ট অনুযায়ী টুরিস্ট ভাগ করিয়া নিন সকলেই যাহাতে সুযোগ পায়—সকলের হাউস-বোটই যাহাতে ভাড়া পায়।' লোকটি উত্তেজিতভাবে বলিল, 'সমিতি কি করে, কিছু না। আপনাপন সুবিধা দেখে। কে আমাদের দেখে? এই দুই-তিনটা মাস মাত্র লোক পাই—সারা বৎসর বেকার বসিয়া থাকি। ও-সব অ্যাসোসিয়েশন কিছু নয়।' ইত্যাদি। বুঝিলাম, অভাবের পীড়নে উত্তেজিত হইয়াছে। আমরা বলিলাম, 'আপনাদের অ্যাসোসিয়েশন যাহাতে একটা নিয়মানু-যায়ী ব্যবস্থায় সকলকেই সমান সুযোগ দেয়, আমরা সেজন্য চেষ্টা করিব।'

কিন্তু চেষ্টা করার কথা বলার পরে এই বিষয়ে যাহা জানিলাম, তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি, সমস্যা অ্যাসোসিয়েশন নয়, আসল সমস্যা রহিয়াছে মূলে। হাউস-বোটওয়ালাদের সমস্যার কথা একজন পদস্থ কর্মচারীকে বলিয়াছিলাম। তিনি হিসাব দিলেন, এই বৎসর টুরিস্ট-সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, পঞ্চাশ হাজার আসিয়া গিয়াছে; টুরিস্ট-

সংখ্যা আরও বাড়িবে। অর্থাৎ টুরিস্ট-সংখ্যা বাড়িলে হাউস-বোটের কারবার ভালই চলিতে বাধ্য।

কিন্তু হাউস-বোটের সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে যাহা জানিলাম, তাহা নিম্নে বলিতেছি।

হাউস-বোটের ইতিহাস—কিভাবে ইহার উৎপত্তি, ক্রমোন্নতি, ব্যবসায় হিসাবে অর্থাৎ হাউস-বোট বিদেশী পর্যটকদের বসবাসের উপযোগী করা হইল—সেই প্রসঙ্গে না গিয়া হালের হাউস-বোট ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি। হাউস-বোটওয়ালারা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। ইহারা মুসলমান হইবার পূর্বে নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিত, রাজতরঙ্গিণীতে ইহাদের বলা হইয়াছে নিষাদ।

বর্তমানে এই হাউস-বোট নৌকাগুলি বেশ ছোটখাট স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ির মত বলিয়াই নামকরণটি সার্থক হইয়াছে। প্রায় ৩২ হাজার লোক এই হাউস-বোট, শিকারা, বার্জ-এর উপর নির্ভরশীল, জীবিকার্জনের ব্যাপারে ইহাই তাহাদের অবলম্বন। জন্মকাল হইতেই ইহারা নৌকা চালায়, নৌকায় বসবাস করে, হাউস-বোটের পিছনেই তাহাদের বসবাসের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট হাউস-বোট থাকে। ইহারা ভাল বাবুর্চি—ইউরোপীয় খানা প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত—পরিবেষণে দক্ষ, ভাল গাইড, পরিশ্রমী। কিন্তু টুরিস্ট না পাইলে ইহারা একেবারেই বেকার। বছরের তিন মাসই ইহাদের উপার্জন। তিন মাসের উপার্জনেই ইহাদের নাকি ৮।৯ মাস ধরিয়া চালাইতে হয়। কিন্তু তিন মাসে প্রভূত উপার্জন হইলেই তাহা সম্ভব ছিল। এই বৎসর টুরিস্ট সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। হয়ত আরও হইবে। কিন্তু টুরিস্টের সংখ্যা বাড়িলেই হাউস-বোটের ভাগ্য প্রসন্ন হইবে না, কারণ বর্তমানে শ্রীনগরে ৩০ ৩৫টি হোটেল, ইহার মধ্যে বেশ বড় সাহেবী ধরণের হোটেলও আছে। পূর্বে হোটেল-সংখ্যা এত ছিল না। সুতরাং এই সম্প্রদায় টুরিস্টদের মোটা অংশ পাইত। বর্তমানে অনেকেই হোটেলে যায়। হোটেলগুলির অর্থসামর্থ্য, সংস্থাগত প্রচার প্রোপাগাণ্ডা প্রভৃতি অধিক। টুরিস্টগণ আকৃষ্ট হয়।

প্রতিযোগিতায় ইহারা হটিতেছে। কোন কোন বোটের মালিক বলিলেন, পূর্বে মহারাজ বেশী হোটেল খুলিতে দিতেন না। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু বিদেশী সৈন্য, বিশেষ করিয়া বহু আমেরিকান সৈন্য, কাশ্মীরে গিয়াছে। ছুটি উপভোগ করিয়াছে। তখন সোনা উড়িয়াছে প্রচুর। হাউস-বোটওয়ালারা এবং কাশ্মীরের শিল্পীরা তখন প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছে। ১৯৪৭ সনে হানাদারগণ কাশ্মীর আক্রমণ করিলে এবং পরে প্রায় তিন বৎসরকাল শ্রীনগরে কোন টুরিস্ট আসে নাই। হাউস-বোট ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের ১১শত হাউস-বোট ছিল, বর্তমানে তাহা ৩শতে দাঁড়াইয়াছে। প্রায় বছর দুই তাহারা যুদ্ধকালের অসম্ভব উপার্জন ভাঙিয়া খাইয়াছে। পরে হাউস-বোটের আসবাবপত্র—তাহাও সামান্য নহে—বিক্রয় করিয়াছে। অনেকে বোটও বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। অনেকের বোট অব্যবহার্য হইয়া যায়। হাউস-বোট মালিক সমিতি আছে। তাহারা তাহাদের দুর্গতির কথা বক্সী সাহেবকে জানায়। তিনি সব জানিয়া ইহাদের বোটগুলি পুনর্নির্মাণে সাহায্য করেন। বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর হাউস-বোট তৈয়ারী করিতে ৩৫।৪০ হাজার টাকা নাকি লাগে। পূর্বে সেই বোট তৈয়ারী করিতে ৮।১০ হাজার টাকা লাগিত। আমাদের হাউস-বোটের মালিক ও সমিতির প্রেসিডেন্ট এইরূপ হিসাবই দিলেন। হাউস-বোট সংস্কারে ও স্যানিটারী ব্যবস্থায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য লম্বা কিস্তিতে কতগুলি বোটকে সরকার ঋণ দান করেন। এককালীন টাকাও সাহায্য দেন। ইহাদের কথায় ইহা বুঝিলাম যে, সরকারী টুরিস্ট অফিসের কর্মচারীরা যদি টুরিস্টদের নিকট হাউস-বোট সুপারিশ করেন এবং হোটেলের প্রতিযোগিতা হইতে ইহারা কিছুটা রেহাই পায়, তাহা হইলে বাঁচিতে পারে, নতুবা দারিদ্র্য ইহাদের ঘুচিবার নহে। তাঁহাদের মোট বক্তব্য এই যে, টুরিস্টদের নিকট ইহাদের হইয়া টুরিস্ট অফিসের কর্মচারীরাও যেন কিছুটা প্রচার করেন। কারণ, হোটেলের মতো ইহাদের প্রচার-ব্যবস্থা নাই। ইহাও বুঝিবার যে, ইহাদের লোক-সংখ্যা বাড়িতেছে। সুতরাং শুধু বোটের ব্যবসায়ে সকলের অন্ন জুটিবার

দিন ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। টুরিস্ট অফিসে, ইহাদের মধ্যে যাহারা কিছুটা লেখাপড়া জানে, তাহাদের কাজ দিলে ভাল হয়। ইহা ছাড়া ছোটখাট শিল্পকার্যে ইহারা যাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে সেই ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনায় এই সমাজের উন্নয়ন-কল্পনা তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। ইহারা কর্মঠ, চতুর, বিশ্বাস-ভাজন, কিন্তু দারিদ্র্যে পীড়িত।

কাশ্মীর খাদ্যশস্যে ঘাটতি প্রদেশ। এই ঘাটতি হ্রাস করিতে হইলে অধিক খাদ্যশস্য, বিশেষ করিয়া ধান্য ফলাইতে হইবে। বর্তমানে বক্সী সাহেব দরিদ্র প্রদেশবাসীর সামর্থ্যের আয়ত্তে ৮৲ টাকা মণ দরে রেশনে চাউল দিতেছেন। রেশনে যে চাউল দেওয়া হয়, আমাদের বোটের মালিক বলিলেন, তাতে মাসের প্রায় সব দিনই চলিয়া যায়, সামান্যই ক্রয় করিতে হয়। এই মূল্যে চাউল সরবরাহ করিতে কাশ্মীর সরকারকে বহু টাকা 'সাবসিডি' দিতে হয়।

উৎপাদন প্রয়াস

শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস দেখিলাম—তাহাই পদ্‌গামপুরের নিকট লিফ্‌ট ইরিগেশন ব্যবস্থা। যে সকল পার্বত্য অঞ্চলে জলাভাবে চাষ হইতে পারে না, অথচ জল পাইলে ভাল চাষ হইতে পারে—সেই সকল অঞ্চলে সেচের জল সরবরাহ করার জন্যই লিফ্‌ট ইরিগেশন। ডিজেলশক্তির সাহায্যে পাম্প করিয়া এই জল গড়ে ১৫ ফুট উর্ধ্বে তোলা হইতেছে। ৩৩টি পাম্পিং যন্ত্রের প্রতিটির দ্বারা মিনিটে ৩৭০০ গ্যালন জল উঠান হয়।

ডিজেল্ ইঞ্জিনে খরচা অনেক বেশী; কিন্তু বিদ্যুৎশক্তির অভাবে উহারই সাহায্য লইতে হইয়াছে। সম্প্রতি সিন্ধু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। সেইখান হইতে বিদ্যুৎশক্তি লিফ্‌ট ইরিগেশনের কাজে লাগাইবার জন্য যন্ত্রপাতি বসান হইয়াছে। তিনটি লিফ্‌ট ইরিগেশন কেন্দ্রে বিদ্যুৎশক্তিতে জল উর্ধ্বে তোলা হইতেছে। বিদ্যুৎশক্তিতে মিনিটে ১২৫০০ গ্যালন জল তোলা সম্ভব হইয়াছে।

অবশ্য সিন্ধু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র হইতে যে বিদ্যুৎ আসিতেছে, তাহা ১৫ মাইল দূর হইতে দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসিতেছে। এই কেন্দ্র হইতে ১৫০ মাইল ক্যানালের মাধ্যমে কৃষকের শস্যক্ষেত্রে জল পৌঁছান হইতেছে। গত ১৯৫৪-৫৫ সনে লিফ্ট ইরিগেশনের দ্বারা
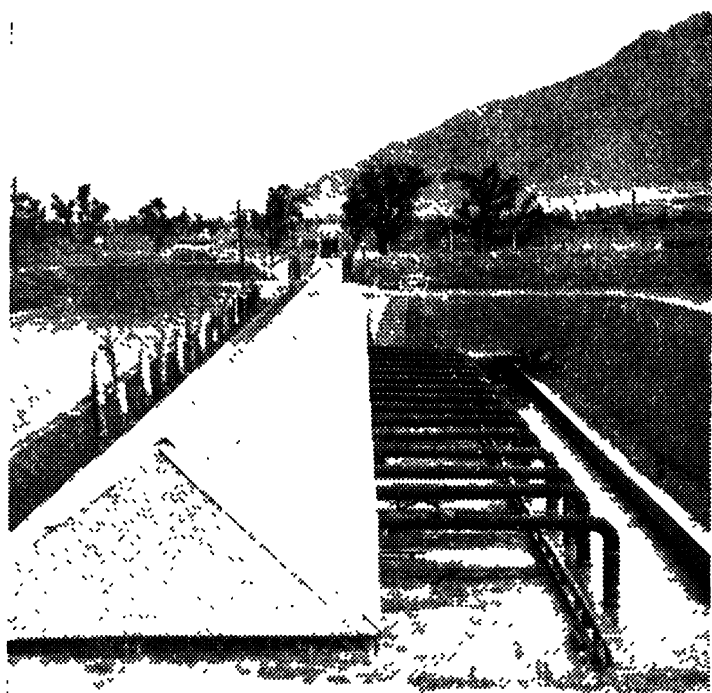
পদ্গামপুরে লিফ্ট ইরিগেশনের পাম্পিং যন্ত্র

কাশ্মীরের ৩০০০ একর জমিতে জল সরবরাহ করা হইয়াছে। এই বৎসর ৭৫০০ একর জমিতে জল দেওয়া হইয়াছে। ফলে এই বৎসরে অতিরিক্ত ধান্যের ফলন হইয়াছে প্রায় ২,৪০,০০০ মণ। গভর্ণমেণ্ট ২৮ হাজার একর জমিতে জল সরবরাহ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতি একরে জল সরবরাহের জন্য কৃষকের উপর ১৬৲ টাকা কর ধার্য করা

হয় কিন্তু একর প্রতি খরচা হইতেছে ৬৪৲টাকার মত। প্রতিমণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য সরকারকে খরচ করিতে হইয়াছে দুই টাকা। কর্তৃপক্ষ বলেন যে, কাশ্মীর সরকারকে বাহির হইতে চাউল আনিয়া যে মূল্যে লোককে সরবরাহ করিতে হয়, তাহাতে সরকারকে 'সাবসিডি' দিতে হয় মণপ্রতি ১৭৲ টাকা। সেই হিসাবে ডিজেলশক্তির অধিক খরচাও স্থূলভই মনে হইবে।

বাদ্‌গাম পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ দেখিলাম। কাশ্মীরের মধ্যে এই বাদ্‌গাম অঞ্চলই সর্বাধিক পশ্চাৎপদ। রাস্তাঘাট ছিল না, জলাভাবে চাষ-আবাদ দুরূহ ছিল। উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রয়াস দেখিয়া এই ধারণাই হইয়াছে যে, স্থানীয় জনসাধারণ আশার আলোক দেখিতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস যে সফল হইতেছে, ইহা সুস্পষ্ট দেখিলাম। বৃক্ষ সম্পর্কে একটা সহজ সচেতনতা কাশ্মীর-বাসীর আছে। তাহারা বৃক্ষসম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধির চেষ্টা করে। ইহা ছাড়া বক্সী গোলাম মহম্মদের নির্দেশ, একটি গাছ কর্তন করিলে সে স্থলে দুইটি চারা রোপণ করিতে হইবে। পল্লীবাসীদের দ্বারা উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনের চেষ্টা করা হইতেছে। বহু ফলবান বৃক্ষের চারা, যথা—বাদাম, মালবেরি, আখরোট, আপেল ইত্যাদি গভর্ণমেণ্ট বিতরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কৃষির কথায় উল্লেখযোগ্য যে কাশ্মীরের গাভী ক্ষুদ্র ও ক্ষীণকায়। ইহার উন্নতি আবশ্যক। সে চেষ্টাও হইতেছে। ভেড়া কাশ্মীরের অধিবাসীদের বড় অবলম্বন। অস্ট্রেলিয়ার ভেড়ার যোগাযোগে উৎকর্ষের চেষ্টা অনেকটা সফল হইতেছে। ভেড়া শুধু মাংস দেয় না, দেয় শালের 'উল'। সাধারণ ভেড়ার লোম নিকৃষ্ট। মিশ্র-প্রজননে কিছুটা উৎকৃষ্ট 'উল' পাওয়া যাইতেছে। তবে এখনও অনেক করিবার আছে। স্থানীয় লোক বলিলেন, 'আমাদের বিশেষ প্রয়োজন ফলবান বৃক্ষের এবং উৎকৃষ্ট ভেড়ার। আর্থিক দিক দিয়া উহাই অধিক লাভজনক।"

পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে ভাল চাষ-আবাদ হইতে পারে, কাশ্মীরে লিফ্‌ট ইরিগেশনের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া কৃষকদের এই ধারণা

জন্মিয়া গিয়াছে। সাধারণত কৃষকদের মন সংরক্ষণশীল। নূতনকে সহজে তাহারা ধরিতে ও বিশ্বাস করিতে চায় না। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য পরিচালনায় সুফল ফলিতেছে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের মনও এই বিষয়ে বেশ সজাগ ও আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে; নূতন কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করিতে আগাইয়া আসিতেছে।

সিন্ধু জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দেখিলাম। ঐ কেন্দ্রের পরিচালনা করিতেছেন ভারতীয় বিশেষ করিয়া কাশ্মীরী অফিসারগণ। একজন
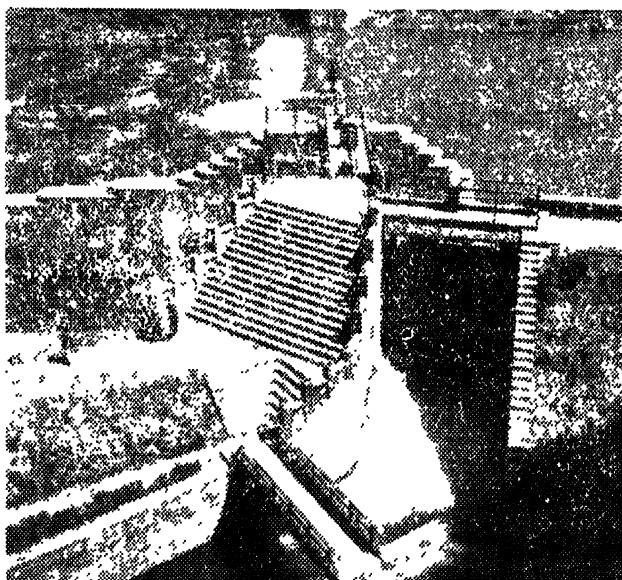
সিন্ধু জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের একটি কেন্দ্রের নিকটস্থ কৃত্রিম খাল

অফিসার কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। তিনি এই বিরাট জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি, কাজকর্ম সব দেখাইলেন, বুঝাইলেন। দুরূহ কর্ম সাধিত হইয়াছে। সিন্ধু নদীর জল মোটা পাইপযোগে ১০ মাইল, দুরূহ উচ্চ পর্বতের উপর দিয়া আনা হইয়াছে; ৪৬২ ফুট উর্ধ্বের

ঐ জল প্রবলবেগে নীচে পড়িতেছে। জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। পূর্বে বারমুলা ক্ষুদ্র পাওয়ার স্টেশন হইতে শ্রীনগরে বিদ্যুৎ আসিত। বর্তমানে এখানকার বিদ্যুৎ-শক্তি শ্রীনগরে তো বটেই উহার উপকণ্ঠেও সরবরাহ করা হইতেছে। অনন্তনাগের জন্য লাইন বসিয়াছে। যে
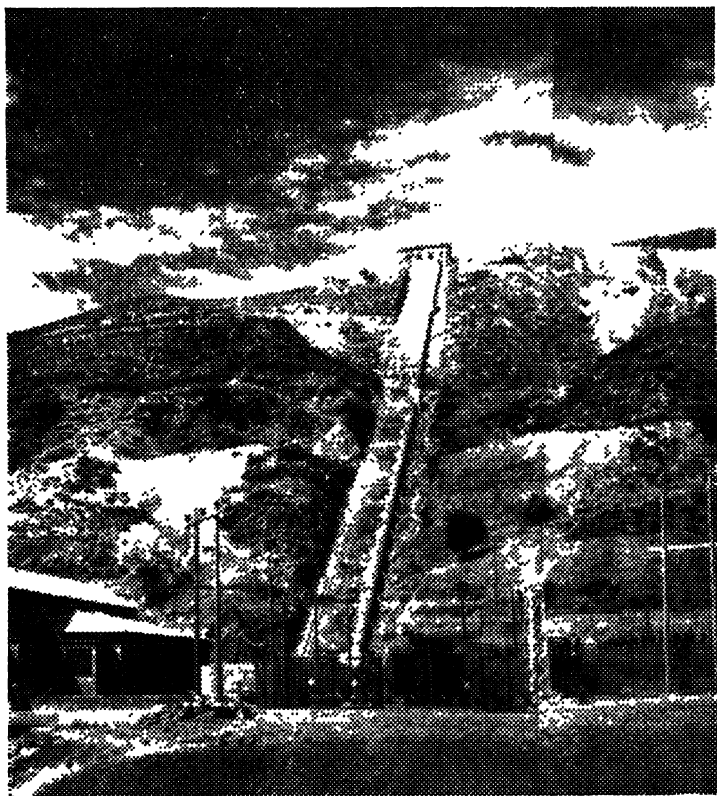
শ্রীনগরের ১৩ মাইল দূরে গান্ধারবলে সিন্ধু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কৃত্রিম খালের একটি দৃশ্য

আয়োজন দেখা গেল, তাহাতে গোটা জম্মু-কাশ্মীরই ভবিষ্যতে অল্পমূল্যে বিদ্যুৎ পাইবে। অফিসারটি পুনঃপুনঃই বলিলেন, এই সিন্ধু কিন্তু পাকিস্তানের সিন্ধু নয়। এই সিন্ধু নদী স্বতন্ত্র একটি নদী,

ইহা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত সিন্ধু নদী। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে লিফ্‌ট ইরিগেশনে এই স্থান হইতে বিদ্যুৎ যাইতেছে। বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এবং দারুশিল্পের কারখানায়ও বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে।

দারুশিল্প কারখানা

কাশ্মীরে দারুশিল্পের (জয়নারী মিলস) কারখানা দেখিলাম। কাঠের এই বিরাট কারখানার জন্য পাহাড় হইতে গাছ কাটিয়া আনা

দারুশিল্পের কারখানা—পাম্‌পুর

হইতেছে, পাহাড়প্রমাণ কাঠ রহিয়াছে। কাঠ চেরাই, কাঠ পাকা করা এবং বিভিন্ন ধরণের কাঠের দ্রব্যাদি নির্মাণ সবই কারখানার যন্ত্রে হইতেছে। এই কারখানায় বর্তমানে দৈনিক ১৫০ জোড়া সম্পূর্ণ দরজা নির্মিত হইয়া বাহির হইতেছে। একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ বর্তমানে ইহার চালক। সাহেব আমাদের সব ঘুরাইয়া দেখাইলেন। কারখানায় যন্ত্রের সাহায্যে কাঠের দ্রব্যাদি তৈয়ারী হইলে কাশ্মীরী কাঠের মিস্ত্রীদের ভাত মারা যাইবে কিনা এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। কাশ্মীরে বন-সম্পদ প্রায় অফুরন্ত। কাঠ কাজে লাগাইতে পারিলে

কাশ্মীরের সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। কারখানায় নির্দিষ্ট মাপে তৈয়ারী দরজা-জানালা প্রভৃতি কাশ্মীরের বাহিরে চালান হইতেছে। কাশ্মীরের দারু-শিল্পিগণ এখানকার তৈয়ারী বিভিন্ন আকারের কাঠ সুলভ মূল্যে নিয়া তাহাদের অভ্যস্ত শিল্পকার্যে লাগাইতেছে।
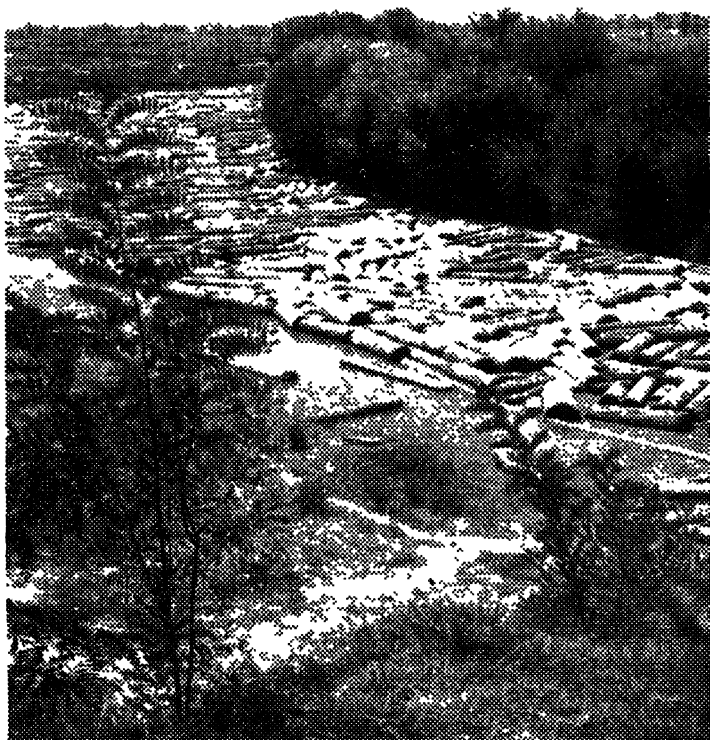
কারখানার জন্য পাহাড় হইতে গাছ কাটিয়া নদীপথে আনা হইতেছে।

কাঠের যে কুটির-শিল্প কাশ্মীরে রহিয়াছে, জয়নারী মিলের দ্বারা তাহার কোন ক্ষতি হইবার নহে, ইহাও জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

কাশ্মীরের সরকারের উদ্যোগে আধুনিক সিল্ক ফ্যাক্টরী এবং

উলেন-ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া উহার কাজকর্ম ও যন্ত্রপাতি দেখিলাম।
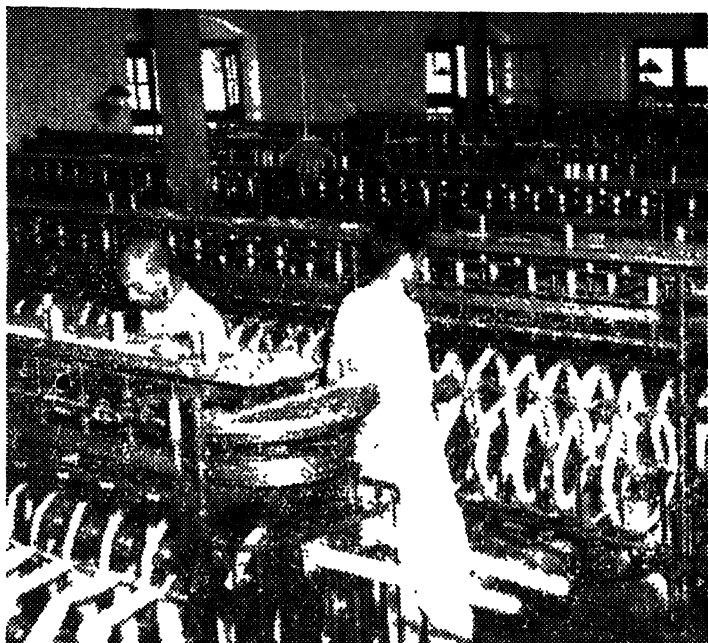
কাশ্মীর সিল্ক ফ্যাক্টরী

মৎস্যের চাষ

কাশ্মীরে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা দেখিলাম। কাশ্মীরের বিখ্যাত মাছ ট্রাউট। যেমন সুস্বাদু তেমনি কণ্টকহীন। অতিশয় শীতল পার্বত্য ঝরনা ভিন্ন এ-মাছ তিষ্ঠিতে পারে না। আচ্ছাবলে ফিশ কালচার দেখিলাম। এখানের ঝরনা অবলম্বন করিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ মনোরম উদ্যান-বাটিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ফোয়ারার কী সে দৃশ্য! পাহাড় হইতে প্রবলবেগে ঝরনা নামিয়া আসিতেছে। চীনার ও অন্যান্য বৃক্ষরাজিতে স্থানটি অতি শীতল। এই চীনার গাছ পারস্য হইতে আনা হইয়াছিল। বিশাল পত্রবহুল বৃক্ষের ছায়া ও পরিবেশ অতি শীতল।

ট্রাউট মাছের শোভা সমারোহ

ঝরনার প্রবাহে অগণিত ট্রাউট নামিয়া আসিতেছে। পূর্বে পাউণ্ড ছিল ৩৲ টাকা। বর্তমানে উৎপাদন অধিক হওয়ায় ২৲ টাকা পাউণ্ড। অনেকটা ভেটকি মাছের মত আকার। মুখ আর একটু ছুঁচলো। রং ঈষৎ কালো। একজন ভ্রমণকারী মাছ লইলেন। দাঁড়াইয়া দেখিলাম। বাঁধানো ঝরনার পাশ হইতে (সহস্র সহস্র ট্রাউট কিলবিল করিতেছে) একজন চাপরাশী একটি ছোট হাতজাল ধরিতেই ১৫।২০টা ট্রাউট উঠিল। জালে রাখিয়াই ওজন হইল। জালেরই পাল্লা। প্রথমটির ওজন হইল ১০ পাউণ্ড। ভদ্রলোক অত বড় লইবেন না। ওটা জলে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আর একটির ওজন হইল ৬ পাউণ্ড। সেটি লইলেন। বহু ছোট ছোট বাঁধানো পুকুরের মত করা হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া একটি হইতে আর একটিতে ঝরনার জল যাইতেছে, বিরাম নাই। এইসব ছোট ও নিচু চৌবাচ্চার মত পুকুরে অগণিত মাছ। চারিদিকে জাল দেওয়া। প্রতিটি চৌবাচ্চায় মাছের বয়স নির্ধারিত রহিয়াছে। ২ মাস, ৪ মাস, ৬ মাস, বয়স ধরিয়া একই আকারের মাছ স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে; বয়স অনুপাতে তাহাদের খাদ্যও স্বতন্ত্র। আমরা ইলিশ মাছের পেটে ডিম হইলে বুঝিতে পারি। মৎস্য চাষের লোকেরা ট্রাউট দেখিয়া ডিম পাড়ার সময় বুঝিতে পারে। ডিমওয়ালা মাছটি আস্তে তুলিয়া লয়, খুব ঠাণ্ডা জলে বা বরফের গায়ে মাছটি রাখিয়া দুই আঙ্গুলে পেটটি টিপিয়া টিপিয়া ডিমগুলি বাহির করে, একটি পাত্রে রাখে। ডিমগুলির আকার অনেকটাই চিতল মাছের ডিমের মত। এবারে ডিম ফুটাইবার ঘরে নিয়া বৈজ্ঞানিক প্রথায় ডিম ফোটানো হয়। তিন সপ্তাহে ডিম ফোটে। সেগুলিকে একটি স্বতন্ত্র আধারে রাখে। কিছুটা বড় হইলে ঝরনার চৌবাচ্চায় নিয়া যায়। এই মাছের শোভা এবং শোভাযাত্রা দেখিয়া আমাদের মত অতিশয় মৎস্যপ্রিয় বাঙালীরও ধরিয়া আনিয়া কাটিয়াকুটিয়া রাঁধিয়া খাইতে ইচ্ছা হয় না,—ইচ্ছা হয় এই অপূর্ব শোভা দেখি, শুধু দেখি। আচ্ছাবলে পিকনিক লাঞ্চ

খাইলাম। হাউসবোটওয়ালাদের বলিলেই তাহারা পিকনিক লাঞ্চের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। যাবতীয় খাদ্যবস্তু, ফল, প্লেট-ডিস, মায় জল, কাঁটা-চামচ, বৃক্ষতলায় পাতিবার গালিচা, ফরাস তাহারা সাজাইয়া নিয়া গিয়াছিল, পরিবেষণও তাহারাই করিল—আবার ধুইয়া-মুছিয়া বাক্সবন্দী করিল। এইসব কাজে তাহারা অতিশয় নিপুণ।

এই আচ্ছাবলেই ঝরনার ধারে বৃক্ষচ্ছায়ায় আমরা যেখানে বিশ্রাম করিতেছিলাম সেখানেই একটু দূরে কয়েকটি স্থানীয় কিশোর বসিয়া ছিল। শিল্পী ভটচাজ তাঁর খাতা পেনসিল লইয়া উহাদের ছবি আঁকিতে বসিলেন। বালকগণ তাহাদের ছবি আঁকা হইতেছে দেখিয়া বেশ উৎসাহের সঙ্গে যেন প্রস্তুত হইয়া বসিল। কিন্তু বাদ সাধিল এই দলেরই একটি অপেক্ষাকৃত বড় ছেলে আসিয়া। সঙ্গী বালকদের সে কি কথা বলিতেই বালকগণ ঘুরিয়া বসিল। আমরা বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই দলের উক্ত বড় ছেলেটি যাহা বলিল তাহার মর্ম ঃ তোমরা সব টুরিস্টরা কাশ্মীরে এসে আমাদের জেনানাদের তসবীর নিয়ে যাও, আমাদের ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে দেখাও আমরা সব মুখ্‌খু-গেঁয়ো ভূত ইত্যাদি—একজন কিশোর বালকের মনেও কিছুটা গোঁড়ামি, জাত্যভিমান ও টুরিস্টদের সম্পর্কে একটা বিরূপ ভাব যে রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া পারিলাম না। অথবা আর দশজন বালকের মত এটি নহে, কিছুটা উদ্ধত বা দাম্ভিক, ইহাই মনে হইল।

* * *

মোগল গার্ডেনস্‌

মোগল গার্ডেনস্‌—তথা সালিমার, নিশাৎবাগ, চেসমিবাগ, আচ্ছাবল, ভেরিনাগ প্রভৃতি ঝরনা, মোগলদের রচিত উদ্যানবাটিকা, ফোয়ারা প্রভৃতি দেখিয়া তাহাদের জীবন উপভোগের 'দর্শন' কিছুটা বুঝা গেল। কাশ্মীর সুন্দর, কিন্তু সেই সুন্দরকে অধিকতর সুন্দর করিযা উপভোগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। বৃক্ষ থাকিলেও বৃক্ষের

শোভা সৃষ্টি মানুষের দ্বারা সম্ভব। যেমন চীনার বাগ ও পপ্‌লার শ্রেণীর বাহার। কাশ্মীরের কতক শোভাসৃষ্টি কাশ্মীরের হালের রাজাদের আমলেও হইয়াছে। রাস্তাঘাট প্রভৃতি সুন্দর করার কৃতিত্ব তাহাদেরও আছে বইকি! কোন কোন স্থান ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশের প্রয়োজনে গড়া হইয়াছে। গুলমার্গ, কিলেনমার্গ প্রভৃতি দেখিলে তাহাই মনে হয়।

* * * *

কাশ্মীরের বিখ্যাত হিন্দু মন্দির ক্ষীরভবানী দেখিতে গিয়াছিলাম। বিরাট হিন্দু মন্দির। সেখানেও ঝরনা ও কুণ্ড আছে। কুণ্ডের মধ্যস্থলে ক্ষীরভবানী বিগ্রহের মন্দির। কাশ্মীরের ধর্মীয় ট্রাস্ট এই মন্দির পরিচালনা করেন। আমরা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম। বিশাল এই মন্দির প্রাঙ্গণ এমনই ছায়াশীতল ও মনোরম যে দেহ-মন জুড়াইয়া যায়।

অনন্তনাগ

অনন্তনাগের মন্দিরে বহু পাণ্ডা দেখিলাম। তাঁহারা বলিতেছেন ঃ আসুন, পূজা দিন, অনন্ত ভগবানের মন্দির এইখানে ইত্যাদি।
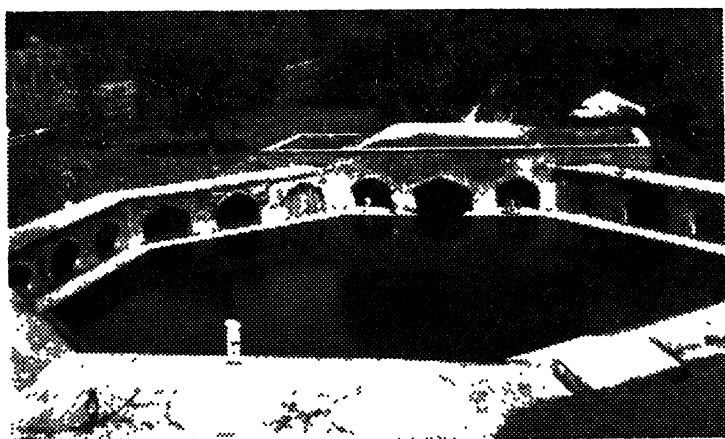
ভেরিনাগে ঝিলাম নদের উৎস মুখ—কাশ্মীর

কোথায় ঘরবাড়ি জানিলেই খাতা বাহির করিয়া কে কোন্ পাণ্ডার শিষ্য বলিয়া দিবে। আমাদের শ্রীঅগ্নিকুমার হোত্রী যেই তাঁহার পিতার নাম বলিলেন, অমনি পাণ্ডা খাতা বাহির করিয়া বাপ-ঠাকুরদার নাম-গোত্র বলিয়া গেলেন। এখানকার ঝরনার জল স্বচ্ছনীল। রোগ
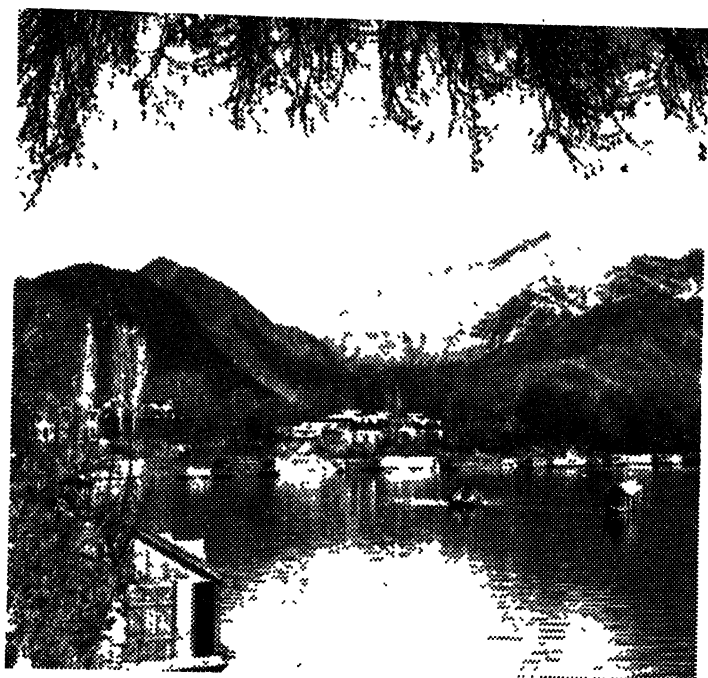
নিবারক বলিয়া খ্যাতি আছে। পুকুর-ফোয়ারা দ্রষ্টব্য। ভেরিনাগে ঝেলামের উৎসমুখ দেখিলাম। এই ঝেলামই প্রাচীন বিতস্তা। স্থানটি মনোরম বলিলে অল্পই বলা হয়।

* * * *

বানিহাল টানেল

কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের অবশিষ্ট অংশের বার মাস যোগাযোগ ছিল না। ইহার ফলে কাশ্মীর শীতের কয়েক মাস সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন

হইয়া থাকিত। কাশ্মীরের বহু আপদে-বিপদে এবং গুরুতর প্রয়োজন-কালে সংযোগ ও যাতায়াতের ব্যবস্থা কার্যকরী থাকা একান্ত আবশ্যক। পূর্বে বানিহাল টানেল ছিল ৯ হাজার ফুট উপর দিয়া। ফলে শীতের কয় মাস বরফে আবৃত থাকায় যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিত। এই অসুবিধা দূর করার জন্য একটি সর্বঋতুতে কার্যকর নূতন সুরঙ্গপথ নির্মাণের উদ্যোগ আরম্ভ হয়। অপেক্ষাকৃত নীচুতে—যেখানে বরফ জমিবে না সেখানে—সুরঙ্গপথ নির্মিত হইলে ভারত-কাশ্মীরের সংযোগ চিরন্তন হইবে। তজ্জন্যই বানিহাল পাহাড়ের ৭২৫০ ফুট উঁচুতে এই টানেল নির্মিত হইয়াছে। দেখিলাম অপূর্ব পূর্তবিদ্যার সাফল্য।

বানিহাল পর্বতমালার কোন স্থানে সুরঙ্গ কাটিতে হইবে—তাহা স্থির করিবার জন্য এই পর্বতমালা এক বৎসর ধরিয়া সার্ভে করিতে হইয়াছে। স্থান নির্ণয়ের পর টানেলের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ শ্রীমাথরানী ইউরোপের বিভিন্ন টানেল পরিদর্শন করেন। বায়ুচলাচল-ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা-ব্যবস্থাদিও স্থিরীকৃত হয়। টানেলের দৈর্ঘ ১½ মাইল। দুই গহ্বর বিশিষ্ট সুরঙ্গপথ নির্মিত হইয়াছে। গহ্বরের উচ্চতা ১৮ ফুট, প্রস্থে ১৬½ ফুট।

কিছুদিন পূর্বেই এই টানেলের শেষ প্রান্ত ডিনামাইটযোগে উন্মুক্ত করা হইয়াছে। আমরা যখন বানিহাল টানেল দেখিতে যাই—তখন টানেলের দুই মুখই উন্মুক্ত হইয়াছে। বাকী ছিল বৈদ্যুতিক আলো এবং যান্ত্রিক বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা। টানেল নির্মাণে বিশেষজ্ঞ একটি জার্মান কোম্পানীকে ২½ কোটি টাকায় কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাদির ব্যয় স্বতন্ত্র। উহার ব্যয় ১ কোটির উপর পড়িবে। এই টানেল নির্মিত হওয়ায় অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের শীতগ্রীষ্ম বার মাস যোগাযোগ-ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইল। টানেলের জন্য এই নূতন স্থান নির্ণয়ের ফলে ভারত হইতে কাশ্মীরে যাওয়ার পথের দৈর্ঘ্য ১৮ মাইল হ্রাস পাইবে। আর সেই ১৮ মাইল পথ অতিশয় দুর্গম পার্বত্যপথ।

কার্যরত জার্মান ইঞ্জিনিয়ারগণকেই শুধু দেখিলাম না, আমাদের

ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণকেও কর্মতৎপর দেখিলাম। বিশেষ ধরণের পোশাকে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া আমরা একটি সুরঙ্গ গহ্বরের অভ্যন্তরে কিছুটা গেলাম। তখনই শুনিলাম, একটি সুরঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অপরটি সম্পূর্ণ হইতে কিছুকাল লাগিবে। সুরঙ্গ-পথটিও যথেষ্ট প্রশস্ত। মধ্যে বাস বা লরি বিগড়াইয়া গেলে পাশে সরাইয়া নিবারও স্থান করা হইয়াছে। পূর্তবিদ্যার এই জয় দেখিয়া আনন্দ পাইলাম। বিশেষ আনন্দ পাইলাম—এই টানেলের পরিকল্পনা ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের শুনিয়া এবং বহু ভারতীয়কে হাতেকলমে কর্মরত অবস্থায় দেখিয়া।

ললিতাদিত্য

ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত মার্তণ্ড মন্দির আজ আর অবশিষ্ট নাই। কিন্তু মন্দিরের ভগ্নাবশেষের চিহ্নস্বরূপ যে ভিত্তি রহিয়াছে তাহা হইতে মন্দিরের গঠন-নৈপুণ্য ও বিস্ময়কর বিশালতা অনুমিত হইয়াছে। ললিতাদিত্য হিন্দু হইলেও বৌদ্ধদের প্রতিও সমদর্শী ছিলেন, সংঘারাম এবং মঠাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ললিতাদিত্যের সময়ে কাশ্মীর শিক্ষা-দীক্ষা শিল্পকলায় উন্নত ও ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠে। কাশ্মীরবাসীর শৌর্যবীর্যের খ্যাতিও এই সময়ে ব্যাপ্তি লাভ করে। ললিতাদিত্যের সময়েও কাশ্মীরের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ ঘটিতে দেখা যায়। দিগ্‌বিজয়ী ললিতাদিত্য গৌড়রাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন বলিয়া কাশ্মীর ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তবে কবি ঐতিহাসিক কল্‌হণ ললিতাদিত্যের অতিথি গৌড়রাজের হত্যাকে বিশ্বাসঘাতকতা না বলিয়া পারেন নাই।

হিন্দু রাজাদের মধ্যে ললিতাদিত্যের পরে উল্লেখযোগ্য রাজা জয়াপীড় ও অবন্তীবর্মা। জয়াপীড়ের শৌর্যবীর্যের খ্যাতিও ছিল অসামান্য। অবন্তীবর্মার অবন্তীপুর এখনো তাঁহার কীর্তির চিহ্ন ভগ্নাবশেষের মধ্যে রক্ষা করিতেছে। তাহাও দেখিলাম। দেখিলাম, অবন্তীপুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ।

অবন্তীবর্মার শাসনকাল ৮৫৪-৮৮৩ খ্রীঃ। একজন কাশ্মীরী মুসলমান অধ্যাপক আমাদের সঙ্গেই অবন্তীপুর দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন যেমন নালন্দায় ছিল বিশ্ববিদ্যালয় তেমনি এই অবন্তীপুরেও ছিল সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়। কাশ্মীরের হিন্দুদের প্রাচীন কীর্তিগুলি বিদেশী ভিন্নধর্মীদের বর্বর আক্রমণে কিভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া বেদনা বোধ না করিয়া পারি নাই। বস্তুতঃ কাশ্মীর-বাসীর ভীরু অপবাদও মিথ্যা। ললিতাদিত্য, জয়াপীড়, অবন্তীবর্মা, জয়নূল আবেদীনের কাশ্মীর বীরত্ব ও রণদক্ষতায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। অত্যাচারে, নিষ্পেষণে তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। ইতিহাসে দেখি, সম্রাট আকবরের এক সেনাপতির আদেশ কাশ্মীরীরা অমান্য করে। ইহারই শাস্তি স্বরূপ কাশ্মীরী পুরুষদের সেখানকার মেয়েদের অনুরূপ পোশাক পরিতে বাধ্য করা হয়।

জয়নূল আবেদীন

ললিতাদিত্যের প্রায় ৮ শত বৎসর পরে সুলতান জয়নূল আবেদীন রাজত্ব করেন। তিনিও ছিলেন গুণগ্রাহী সমদর্শী—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্ম ও সংস্কৃতির সমাদর করিতেন। তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন। কাশ্মীরে সংস্কৃত ভাষার উন্নতির জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার শাসনকার্যে তিনি কাশ্মীরী পণ্ডিতগণকে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হিন্দুদের নানা উৎসবে তিনি আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতেন। তিনি কাশ্মীরে গো-হত্যা বন্ধ করিয়াছিলেন। মহাভারত ফারসীতে অনুবাদ করাইয়া-ছিলেন। বিস্ময়ের কথা এই যে এই জয়নূল আবেদীনের পিতা সিকান্দর কাশ্মীরে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির নিশ্চিহ্ন করিয়াছিলেন,—তাঁহার সময়ে হিন্দু নিগ্রহ ও মুসলমানকরণ চলিয়াছিল। আবার এই গর্হিত ও নিন্দিত কাজ চলিয়াছিল সিয়াবুথ নামক এক হিন্দু কালাপাহাড়ের সক্রিয় প্রচেষ্টায়। সিয়াবুথ নূতন মুসলমান হইয়াছিল। আশ্চর্যেরই কথা, সিকান্দর হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করেন আর তাঁহারই পুত্র হিন্দু

মন্দির নির্মাণ করেন—সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে দূর করেন। জয়নূল আবেদীন তাঁহার মায়ের সমাধির উপর এক জুম্মা মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উহা শ্রীনগরের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান।

কাশ্মীরী শাল

কাশ্মীরী শালের উৎকর্ষের মূলে জয়নূল আবেদীনের দান অসামান্য। তরুণ বয়সে তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দে গিয়া সেখানকার শিল্পকলা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করিয়া তিনি সাত বৎসর পরে সেদেশের শিল্পীদের সঙ্গে করিয়া আনেন।

তৈমুর শুধু দেশ জয় ও লুণ্ঠনাদিই করেন নাই, বিভিন্ন দেশ হইতে শিল্পী ও তাহাদের শিল্প-নিদর্শনাদি সমরখন্দে লইয়া তথাকার শিল্পগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। জয়নূল আবেদীনকে কেন সমরখন্দে যাইতে হয়, সাত বৎসর বাধ্য হইয়া থাকিতে হয়, তাহা এক দীর্ঘ ইতিহাস। এখানে তাহা আর উল্লেখ করিব না। শাল বয়ন ও শালের উপর কারুকার্যের উন্নতি এবং উহার বিশ্বব্যাপী খ্যাতির মূলে জয়নূল আবেদীনের প্রয়াস চিরস্মরণীয়।

কাশ্মীরের শাল, কাশ্মীরের কাষ্ঠ ও ধাতুশিল্পাদির বৈশিষ্ট্য 'কাশ্মীয়ার' নামে খ্যাত। ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে কাশ্মীরী শিল্পের স্বাতন্ত্র্যের মূলে বহু বিচিত্র বৈদেশিক প্রভাব কাজ করিয়াছে।

কাশ্মীরী শালের খ্যাতি আজও পৃথিবীময়। সুপ্রাচীন কাল হইতেই কাশ্মীরের শাল দেশ-বিদেশে সমাদৃত। এই শিল্পের উৎকর্ষ ঘটিয়াছে স্থানীয় শিল্পিগণের প্রতিভার স্বকীয়তায় এবং পারস্য, সমরখন্দ প্রভৃতি স্থানের শিল্পসৌন্দর্য গ্রহণ ও আয়ত্ত করায়। কিন্তু শাল-বয়ন-শিল্পিগণ নানাভাবে শোষিতই হইয়াছে। শাল ব্যবসায়ে লাভবান হইয়াছে দালালগণ, রাজকর্মচারিগণ এবং শাসকগণ। প্রকৃত শিল্পিগণ শুধু নিদারুণ ভাবে বঞ্চিতই হইয়াছে। বহু রাজনৈতিক বিপর্যয়, বশ্যতা এবং নিপীড়ন সত্ত্বেও কাশ্মীরের শিল্পিকুল কেমন করিয়া যে তাহাদের শিল্পবোধকে দীর্ঘদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহাও এক বিস্ময়।

কাশ্মীরের শিল্পিগণ দেশীয় গাছগাছড়া ও অন্যান্য দ্রব্য সংযোগে তিনশত প্রকারের রং তৈয়ারী করিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উহা ৬৪ প্রকারে নামে। তাহাদের রং ৫ শত বৎসরেও বিকৃত হইত না। কিন্তু ইউরোপের কৃত্রিম রং আসিয়া সেই বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়াছে। যন্ত্রযুগের প্রস্তুত দ্রব্যাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাহারাও সেকালের উচ্চাঙ্গের শিল্পনির্মাণ-গৌরব হারাইতেছে। যে-শিল্পকার্য সম্পূর্ণ করিতে তাহাদের এক বৎসর লাগিত, বর্তমানের দ্রুতগতি যুগে তাহা বজায় থাকিবার নহে। ফলে শিল্পীকেও ভেজাল বা তাহাদের দৃষ্টিতে যাহা অসুন্দর তাহাই বাজারে অন্নের দায়ে চালাইতে হইতেছে। বর্তমান সরকার শাল-শিল্পরক্ষার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন, কিন্তু আধুনিক চাহিদা ও রুচি নিম্ন স্তরের বলিয়া পূর্বেকার বৈশিষ্ট্য কতটুকু রক্ষা পাইবে,সন্দেহ। তবে বর্তমানে সেকালের অন্তহীন শোষণ দূর হইয়াছে। এক আনা, ছয় পয়সা যে শিল্পীর দৈনিক উপার্জন ছিল, সেই ধরণের শিল্পীর উপার্জন বর্তমানে অনেক বেশী। পূর্বের বহুবিধ বে-আইনী আদায়, শোষণ ও জুলুমেরও অবসান ঘটিতেছে। এই শিল্পের কারিগর এবং ব্যবসায়ীর উপার্জনের তারতম্য অবশ্য এখনও আছে, তবে তাহারও ব্যবধান ক্রমে হ্রাস পাইতেছে।

কাশ্মীরের পূর্ব ইতিহাস

কাশ্মীরের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে হইলে কাশ্মীরের পূর্বেকার রাজনৈতিক ইতিহাস কিছুটা স্মরণ করা ভাল।

কল্হনের "রাজতরঙ্গিণী"তে প্রায় ২ হাজার বৎসরের রাজাদের কাহিনী লিখিত আছে।

হিন্দু রাজাদের আমল ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। পরে বিদেশ হইতে আগত (১৩৩৯ খ্রীঃ) মুসলমান সুলতানগণের রাজত্বকাল।

মুসলমানদের মধ্যেও নানা বংশ রাজত্ব করে। সুলতান, চক, মোগল। মোগল অধিকার শেষ হয় ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে। তাহার পর

আফগান অধিকার। গভর্ণর দ্বারা শাসিতকাল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ মুসলমানকালে—জয়নুল আবেদীন এবং ২।১ জন ভিন্ন প্রায় সকল আমলেই—চলিয়াছে লুণ্ঠন, শোষণ এবং ধর্মান্তরিতকরণের জুলুম। কবি ইক্‌বালের পূর্বপুরুষও ধর্মান্তরিত হন। কাশ্মীরে ধর্মান্তরিতকরণে নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ হইয়াছে সত্য, তবে সাধুসন্তরা যে ইস্‌লাম প্রচার করিয়াছেন—তাহারও প্রভাব আছে।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা রণজিৎ সিং কাশ্মীর জয় করেন। প্রথম আক্রমণ (১৮১৪ খ্রীঃ) ব্যর্থ হয়। ১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যে মুসলমান শাসন কায়েম হইয়াছিল, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহারই অবসান ঘটে।

কাশ্মীর যুদ্ধে রাজপুত সেনাদল (১৯৪৭-৪৮) লুক্কায়িত শত্রুর সন্ধানে

শিখ শাসন আসলে গভর্ণরদেরই শাসন। দেখা যায়, ৭ বৎসরে দশজন গভর্ণর কাশ্মীর শাসন করেন। এই অধ্যায়ও কুশাসনেরই অধ্যায়। অতঃপর ব্রিটিশের আবির্ভাব। অমৃতসর সন্ধিসূত্রে মহারাজ গুলাব সিং কাশ্মীরে আধিপত্য লাভ করেন। ইহাই কাশ্মীরে রাজপুত

ডোগরা শাসনের পত্তন। ডোগরা রাজারা পর পর,—রণবীর সিং, প্রতাপ সিং, হরি সিং,—গুলাব সিংহের পর কাশ্মীর-জম্মু শাসন করেন। রণবীর সিং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহে বিশেষ উৎসাহ দান করেন। প্রদর্শনীতে বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত দেখিলাম। বাংলার জয়দেবের গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপিও কাশ্মীরে রক্ষিত। শেষ রাজা হরি সিংহের আমলেই (১৯২৫-১৯৪৭) কাশ্মীরে জন-জাগরণ আরম্ভ হয়। কাশ্মীরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় "মুসলিম কন্‌ফারেন্স"। শেখ আবদুল্লা, বক্‌সী গোলাম মহম্মদ প্রভৃতি নায়ক। ১৯৩২ সন হইতে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত কাশ্মীর "ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স" ভারতের কংগ্রেসের সমর্থনে, সাহায্যে এবং কংগ্রেসেরই অসাম্প্রদায়িক গণ-আন্দোলনের আদর্শে পরিচালিত হইতে থাকে। কাশ্মীরের ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স তখন অসাম্প্রদায়িক ও শক্তিশালী, দ্বিজাতি-তত্ত্বের বিরোধী। অতঃপর ১৯৪৭ সনে অক্টোবরে পাকিস্তানী হানা, রাজ্যের ভারতে অন্তর্ভুক্তি এবং রাজার ক্ষমতা ত্যাগ।

ভারত-ভুক্তির পটভূমি

কাশ্মীররাজ কর্তৃক কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সুসিদ্ধ হইবার পর ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কাশ্মীররাজ রাজ্যে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। রাজার ভারতভুক্তি আইন সিদ্ধ হইলেও ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কাশ্মীরে প্রতিনিধি-মূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। মহারাজা তাহা মানিয়াই ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের নেতা শেখ আবদুল্লাকে অন্তর্বর্তী-কালীন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে আহ্বান করেন। শেখ আবদুল্লা প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করেন। বক্‌সী গোলাম মহম্মদ প্রভৃতিকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

কিন্তু ইহারও পূর্বেকার রাজনৈতিক ইতিহাস স্মরণ করিবার মতো।

জম্মু-কাশ্মীরে নিম্নোক্ত রাজনৈতিক দলগুলি ছিল ঃ (১) ন্যাশন্যাল কনফারেন্স, (২) মুসলিম কন্‌ফারেন্স, (৩) যুবক সভা (কাশ্মীর

'পণ্ডিতদের' রাজনৈতিক সভা), (৪) গুরু সিং সভা, (৫) প্রজা পরিষদ।

কাশ্মীর রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সংস্থার ইতিহাস নিম্নরূপ। শেখ আবদুল্লা প্রভৃতির নেতৃত্বে ১৯৩২ সালে মুসলিম কন্‌ফারেন্স নামে যখন রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয় তখনই সাম্প্রদায়িক গোঁড়া দলের ধর্মগুরু মীর ওয়াইজ শেখ আবদুল্লার বিরোধীরূপে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 'আজাদ কন্‌ফারেন্স' নামে তিনি দল গঠন করেন। শেখ আবদুল্লার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও বিরূপতাই ছিল মীর সাহেবের প্রধান প্রেরণা, কোন রাজনৈতিক মতবাদ নহে। কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান রাজ্য—এই রাজ্যে রাজনীতি করিতে হইলে উহার নেতৃত্ব করিবে তাঁহার ন্যায় ধর্মগুরু। তাই শেখ আবদুল্লার নেতৃত্ব নাশের তাগিদেই যেন মীর ওয়াইজ রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

শেখ আবদুল্লাদের মুস্‌লিম কন্‌ফারেন্স-এর দাবী ছিল কাশ্মীর-রাজের স্বৈরশাসনের স্থানে প্রজাদের শাসনক্ষমতা লাভ তথা প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। রাজা হিন্দু। প্রজাদের অধিকাংশ মুসলমান। সে কারণে আন্দোলন কিছুটা সাম্প্রদায়িকরূপ ধারণ করে। যেন হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজাদের দাবী প্রতিষ্ঠার-ই আন্দোলন। এই আন্দোলনে কিছু সাম্প্রদায়িক গোলযোগও ঘটে, যদিও উক্ত আন্দোলনের নেতাদের তেমন ইচ্ছা ছিল না। ভারতের সকল দেশীয় রাজ্যেই প্রজাদের আন্দোলন চলিতেছিল, ভারতের কংগ্রেসের আদর্শে, সমর্থনে ও সাহায্যে। কাশ্মীরের আন্দোলনও সেই খাতে চলাই বাঞ্ছনীয়। সেই কারণেই পরলোকগত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার (তিনি কিছুকাল কাশ্মীর-রাজের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন), শেখ আবদুল্লা, বক্‌সী গোলাম মহম্মদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে তাঁহাদের সম্মেলনের নাম পরিবর্তন করিয়া উহা অসাম্প্রদায়িক জাতীয় করিবার সুপরামর্শ দেন। তখন (১৯৩৯) উহার নাম করা হয় ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স। রহস্য এই, যেই শেখ

আবছুল্লার নেতৃত্বে মুসলিম কন্‌ফারেন্স ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স নাম গ্রহণ করে, অমনি একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই মীর ওয়াইজ তাঁহার আজাদ কন্‌ফারেন্স-এর নাম ত্যাগ করিয়া তাঁহার দলের নাম রাখেন 'মুসলিম কন্‌ফারেন্স' এবং ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স-এর বিরোধিতায় লাগিয়া যান। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরের মুসলমান জনসাধারণও সংগ্রামী ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স-এরই অনুগমন করে, মীর ওয়াইজের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুসলিম কন্‌ফারেন্স-এর নেতৃত্ব স্বীকার করে না। এই মীর ওয়াইজ-মার্কা মুসলিম কন্‌ফারেন্স শেষ পর্যন্ত ভারতের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের এবং উহার নেতা মিঃ জিন্নার দোসর ও ভাড়াটে রূপেই জম্মু-কাশ্মীরের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বিদূষকের অভিনয় করিতে থাকে। মিঃ জিন্না এই ধরণের মোল্লাজাতীয় কাশ্মীরী মুসলমানদের উপরেই ভরসা করিয়াছিলেন।

দেশবিভাগের ভিত্তিতে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান যে পার্লামেণ্টারী বিধানে সুসিদ্ধ হইল, তাহাতেই ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন সত্তা দেখা দেয়। দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। স্বাধীন থাকা সম্ভব হইলে, স্বাধীন থাকিতে পারে। অন্তর্ভুক্তি বা অ্যাক্‌সেশন হইবে কি হইবে না তাহা স্থির করিবে দেশীয় রাজ্যের নরপতি; এই অ্যাক্‌সেশন আইনসম্মত করার অধিকার বা ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যের নরপতিরই ছিল। কাশ্মীররাজ এবং তাঁহার উপদেষ্টাগণ, এমন কি কাশ্মীরের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণও বৃটিশ শক্তির অবসানের সুবর্ণ সুযোগে স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ইহা বাস্তব আকারে দেখা দিতে পারে কিনা সেই প্রশ্ন উঠিলে ক্ষুদ্রকায় সুইজারল্যাণ্ড যেমন ইউরোপ ভূখণ্ডে স্বাধীন তেমনি কাশ্মীরও স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে অবশ্য অবস্থান করিতে পারে, এমনই একটা অস্পষ্ট আশা ও চিন্তা এবং যুক্তি কাশ্মীর দরবারে কাজ করিতেছিল।

এদিকে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র দেখা দিবার সঙ্গে

সঙ্গেই কায়েদে আজম জিন্না তাঁহার আশা ও স্বপ্ন সফল করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের দাবী তিনি তুলিয়াছিলেন, সেই তত্ত্বের প্রতি তাঁহার একান্ত লুব্ধতায় তিনি মুসলিমপ্রধান রাজ্য কাশ্মীরের অধিকারী হইবেনই এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল। যতটা প্রকাশ, কাশ্মীর পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হইবে, যেহেতু কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান, এই আশ্বাস মাউণ্টব্যাটেন সাহেবও মিঃ জিন্নাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজা প্রথমে ভারত ও পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। উপরন্তু পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইতে তাঁহার নিজস্ব প্রবল বিরূপতা ছিল। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দুনিধন তিনি দেখিয়াছেন; কাশ্মীরের হিন্দুগণ পাকিস্তানে ধ্বংস হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কা হইতেই কাশ্মীরের মহারাজা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন—মিঃ জিন্নার নানা প্রতিশ্রুতি, প্রলোভন, এমন কি সম্পূর্ণ স্বাধীন নরপতির অধিকার তিনি লাভ করিবেন, এইরূপ আশ্বাসদান সত্ত্বেও। কাশ্মীররাজের সম্মতি লাভ বিলম্বিত হইতেছে দেখিয়া মিঃ জিন্না নিজেই (তখন তিনি পাকিস্তানের গভর্ণর-জেনারেল, যেমন মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল) কাশ্মীরে যাইবার জন্য উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। নিজে মহারাজকে পত্র দিলেন: আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়। চিকিৎসকগণ আমাকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কিছু কাল কাশ্মীরে থাকিতে বলিতেছেন। আপনার সম্মতি পাইলেই আমি রওনা হইব (তখন মিঃ জিন্না লাহোরে)। মহারাজা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিয়া মিঃ জিন্নাকে এই মর্মে পত্র দিলেন: আপনি কাশ্মীরে আসিতে চাহিয়াছেন, ইহা বড়ই সুখের কথা। তবে একটি রাষ্ট্রের গভর্ণর-জেনারেল আপনি, আপনার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও সম্মান দেখাইতে বর্তমানে আমি নিতান্ত অক্ষম। মহারাজার এই প্রত্যাখ্যান-পত্রে স্বভাবতঃই মিঃ জিন্না উত্তেজিত ও বিরক্ত হইলেন, অপমানিত বোধ করিলেন। ইহাও এখানে উল্লেখ থাকে যে, মিঃ জিন্না এমন কথাও মহারাজাকে

জানাইয়াছিলেন, যে, শুধু মহারাজার সম্মতিই আবশ্যক, তাঁহার (জিন্নার) কাশ্মীরে অবস্থানকালীন যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি নিজেই করিবেন।

কাশ্মীর যেহেতু মুসলমানপ্রধান প্রদেশ সেহেতু ইহা তাঁহার করতলগতই, এমন আশা মিঃ জিন্নার ছিল, বলিয়াছি। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, মহারাজা অ্যাকসেশনে সম্মত হইতেছেন না, নানা ওজর আপত্তিতে সময় কাটাইতেছেন। মহারাজাকে সম্মত করাইতে পারিলে কাজটা সহজ হয়, অন্যথায় বলপ্রয়োগেই উহা দখল করিতে হইবে, তাহাও বিশেষ কিছু শক্ত নহে ; মিঃ জিন্না ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য কাশ্মীরে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে পাঠাইয়া পাকিস্তানের অনুকূলে দল পাকাইতে লাগিলেন। রাজ্যের শান্তির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর ও আপত্তিজনক হইলেও কায়েদে আজমের প্রেরিত দূতটি দুষ্কার্য করিতেই লাগিলেন, দলে মোল্লাদের ও মুসলিম কনফারেন্স-এর লোকদের ভিড়াইতে লাগিলেন। ভারতের বিরুদ্ধে ও পাকিস্তানের স্বপক্ষে প্রচার চলিতে লাগিল, সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদ, ইসলামের দোহাই দিয়া কাফের হিন্দু রাজার প্রতি আনুগত্য নাশের বিবিধ চেষ্টা চলিল। কাশ্মীরের মহারাজা তখন কায়েদে আজমের সেক্রেটারিকে প্রথম সংযত করিতে চেষ্টা করিলেন, পরে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে 'ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স' ছিল ভারতীয় কংগ্রেসের আদর্শের অনুগামী। ঐ আন্দোলনের শেখ আবদুল্লা, বক্‌সী গোলাম মহম্মদ প্রভৃতি নায়কগণ ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি, বিশেষ করিয়া শ্রীনেহরুর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেস যখন বৃটিশ শক্তির অবসানের তথা জনগণের রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালাইতেছিল তখন ভারতের দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের দ্বারাও রাজন্যবর্গের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের শাসনক্ষমতা-লাভের আন্দোলন চলিতেছিল। বলা বাহুল্য, ভারতীয় কংগ্রেসের সাহায্য সমর্থন ছিল উহার পশ্চাতে। কাশ্মীরের মহারাজা

ন্যাশন্যাল কনফারেন্সকে দাবাইতে সচেষ্ট হন। শেখ আবদুল্লা ও সঙ্গিগণ পুনঃ পুনঃ গণদাবীর আন্দোলনে ধৃত ও কারারুদ্ধ হইতে থাকেন। যেমন বৃটিশ ভারতে কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও কর্মিগণ বৃটিশ প্রভুদের দ্বারা নির্জিত ও কারারুদ্ধ হইতে থাকিলেও মিঃ জিন্না বৃটিশকেই সমর্থন করিতেন, কংগ্রেসীরা ছিল চক্ষুশূল; কাশ্মীর ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স তথা উহার মুখপাত্র ও নেতা শেখ আবদুল্লা ছিলেন কায়েদে আজমের তেমনি চক্ষুশূল। শেখ আবদুল্লা মিঃ জিন্নার পাকিস্তান দাবীর ভিত্তি দ্বিজাতি তত্ত্বের ঘোরতর বিরোধী—শুধু জাতীয় আদর্শের জন্য নয়, মুসলমান সমাজের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণেরও পরিপন্থী বলিয়া; শেখ আবদুল্লা সভা-সমিতিতে ও বিবৃতিতে তাহাই রফাহীনভাবে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেন। মিঃ জিন্নার রাগ ও ক্ষোভের অন্ত ছিল না। মুসলিমপ্রধান অঞ্চল কাশ্মীরের উপর মিঃ জিন্নার আশাভরসার প্রবল বাধা ও দুরূহ কণ্টক রূপে ছিলেন শেখ আবদুল্লা। শেখ আবদুল্লার প্রতি সেদিনে তাঁহার প্রযুক্ত বিশেষণগুলি ভদ্রতার সীমাই লঙ্ঘন করিত। শেখ আবদুল্লা গুণ্ডাসর্দার, শো-বয়, ভাড়াটে, এমনি অনেক কিছু বিশেষণে বিশেষিত হইতেন। যেমন বৃটিশ ভারতে কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগ্রামের বিরুদ্ধতা করিতে বৃটিশ শক্তিকেই মুসলিম লীগ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তেমনি কাশ্মীরেও জিন্না-রাজনীতি সেই ধারায়ই চলিতে লাগিল। কাশ্মীরের রাজশক্তি কর্তৃক শেখ আবদুল্লা তথা ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স-এর দমনপ্রয়াস মিঃ জিন্নার দলের সমর্থন লাভ করিল। প্রগতিবিরোধী কাশ্মীর প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক্ মিঃ জিন্নার পরম বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স-এর অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য শেখ আবদুল্লা কর্তৃক আমন্ত্রিত কংগ্রেস-নায়ক শ্রীনেহরু কাশ্মীরের পথে গ্রেফতার হইলেন। কংগ্রেস-সমর্থিত কাশ্মীরের ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স কাশ্মীর রাজশক্তি কর্তৃক নিপীড়িত হইতেছে, ইহা মিঃ জিন্নার ছিল সান্ত্বনা—এই আশাও তাঁহার ছিল, এই সুযোগে তাঁহার আশীর্বাদপুষ্ট সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুসলিম কন্‌ফারেন্স শক্তি সঞ্চয়

করিবে, কিন্তু সেই আশা বৃথাই ছিল। বৃটিশের ক্ষমতা ত্যাগের পরে কাশ্মীর রাজার কাছে শেষ পর্যন্ত মিঃ জিন্না ইহাই চাহিতেন যে, মহারাজা যেন ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোন মতেই না হন বরং স্বাধীন থাকেন।

ইউ এন অবজারভার দলের অফিসার সহ ভারতীয় সেনানায়ক পার্বত্যনদী পার হইতেছেন। যুদ্ধ-বিরতি সীমান্ত।

কাশ্মীরের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই মিঃ জিন্না ছলে বলে কৌশলে কাশ্মীর লাভের প্রয়াস চালাইলেন। স্থিতাবস্থার

সর্ত অমান্য করিয়া কাশ্মীরকে 'ভারতে' মারিবার ব্যবস্থা করিয়াও চাপ দিতে লাগিলেন।

এদিকে ভারত থাকিল নিশ্চেষ্ট। এমন কি মহারাজা কর্তৃক ভারত-ভুক্তি বা অ্যাকসেশন প্রস্তাব আদর্শবাদী শ্রীনেহরুর নিকট বড় বলিয়া মনে হয় নাই ঃ তাঁহার কাছে বড় ছিল, কাশ্মীর প্রজাদের নিকট তথা ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স-এর নেতৃবর্গের নিকট মহারাজের ক্ষমতা হস্তান্তর।

তুষারাবৃত 'জো-জিলা' ভেদ করিয়া ভারতীয় সৈন্য পথ করিয়া অগ্রসর হইতেছে, ১৯৪৮ সাল—নেতৃত্বে জেনারেল থিমায়া।

মহারাজ যখন দ্বিধাগ্রস্ত,—পাকিস্তানে যোগদানে অনিচ্ছুক—মিঃ জিন্নার কাশ্মীরে স্বাস্থ্যান্বেষণে যাইবার অনুরোধ মহারাজা কর্তৃক

প্রত্যাখ্যাত—তখন বলপ্রয়োগের তথা কাশ্মীর আক্রমণের কর্মনীতিই মিঃ জিন্না গ্রহণ করিলেন। শেখ্ আবদুল্লা তখন কারারুদ্ধ।

কাশ্মীর অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক নেতারা এবং কাশ্মীর বাহিনীর মুসলমানদের কতক অংশ পাকিস্তানের অনুকূলে প্রস্তুতই ছিল। পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে উপজাতীয় লুণ্ঠনপ্রয়াসীরাও যোগ দিল। পাকিস্তানী প্ল্যান অনুযায়ী আরম্ভ হইল চতুর্দিক হইতে জম্মু-কাশ্মীর আক্রমণ। মহারাজা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শেখ্ আবদুল্লা প্রভৃতিকে কারামুক্ত করিলেন। পরবর্তী অধ্যায় মহারাজের ভারত-ভুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বিপন্ন ও শরণার্থী কাশ্মীর রক্ষায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় সৈন্যের অভিযান—উহা স্বতন্ত্র অধ্যায়।

জনপ্রতিনিধিদের হস্তে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করা হইল। ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স-এর নেতা শেখ্ আবদুল্লা হইলেন মুখ্য মন্ত্রী। শ্রীনেহরু ইহাই চাহিয়াছিলেন।

শেখ্ আবদুল্লার মতিভ্রম

শেখ্ আবদুল্লা বক্‌সী গোলাম মহম্মদ প্রভৃতির সহিত শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। শেখ্ আবদুল্লার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আবদুল্লা শ্রীনেহরুরও বিশেষ প্রিয় ও বিশ্বাসভাজনই ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে, অনেকেই মনে করেন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রভাবে এবং কতকটা নিজের উচ্চাশায় কাশ্মীরকে একেবারে তিনি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা পোষণ করিতে থাকেন। ইহা লইয়া নিজের মন্ত্রিসভায় বিশেষ করিয়া বক্‌সী গোলাম মহম্মদের ন্যায় শক্তিমান সুহৃদ ও সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটে। শেখ্ আবদুল্লার এই প্রয়াসকে তাঁহারা ভারতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়াই মনে করেন। কাশ্মীর স্বাধীন রাষ্ট্র হইলে, পাকিস্তান আনন্দে তাহা স্বীকার করিবে, অপর বিদেশী রাষ্ট্রও করিবে। এমন আশাই আবদুল্লার ছিল। প্রথমে এই আভ্যন্তরীণ মতান্তর বাহিরে বিশেষ প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু

প্রত্যাখ্যাত—তখন বলপ্রয়ো
কর্মনীতিই মিঃ জিন্না গ্রহণ
কারারুদ্ধ।

কাশ্মীর অভ্যন্তরে সাম্প্রদা
মুসলমানদের কতক অংশ পাকিস্ত
বাহিনীর সঙ্গে উপজাতীয় লুণ্ঠ
প্ল্যান অনুযায়ী আরম্ভ হইল
মহারাজা অবস্থার গুরুত্ব উপল
কারামুক্ত করিলেন। পরবর্তী অ
গ্রহণ। বিপন্ন ও শরণার্থী কা
সৈন্যের অভিযান—উহা স্বতন্ত্র

জনপ্রতিনিধিদের হস্তে শ
ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স-এর নেতৃ
শ্রীনেহরু ইহাই চাহিয়াছিলেন।

শেখ্ আব

শেখ্ আবদুল্লা বক্‌সী গোলা
গ্রহণ করেন। শেখ্ আবদুল্ল
শ্রীনেহরুরও বিশেষ প্রিয় ও বিশ্ব
পরে, অনেকেই মনে করেন, ব
নিজের উচ্চাশায় কাশ্মীরকে এক
প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা পোষণ ক
মন্ত্রিসভায় বিশেষ করিয়া ক
সুহৃদ ও সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁহার
প্রয়াসকে তাঁহারা ভারতের প্রতি
কাশ্মীর স্বাধীন রাষ্ট্র হইলে, পা
অপর বিদেশী রাষ্ট্রও করিবে।
এই আভ্যন্তরীণ মতান্তর বাহির

তিক চেতনা

ধ্যে রাজনৈতিক চেতনা কতটা জাগ্রত
লায়ও বলা শক্ত। মোটামুটি বিশ্বাস-
রিত্রিক প্রভাব ও জনসেবানিষ্ঠা এবং
আকৃষ্ট করে। বক্‌সী গোলাম মহম্মদ
ণেরই মানুষ তিনি; কাশ্মীরের ন্যাশন্যাল
। নির্বাচনে ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সই
নাই (তাহাই হইয়াছে)। শহর শ্রীনগরে
মত আছে। নির্বাচনে বিরোধী পক্ষের
তবে পল্লী অঞ্চলে ন্যাশন্যাল কন-
। কিছুটা শেখ্ আবদুল্লাপন্থী, কিছুটা
লক্ষ্য ভিন্ন হইলেও) বর্তমান সরকারের
াটের উপর বর্তমান সরকার জনপ্রিয়তা
হাতে সন্দেহ নাই। অবস্থা দেখিয়া
রবিরোধী ব্যক্তি ও দল থাকিলেও
ত শক্তি তাহাদের নাই। আর
ন্তব নহে। "প্লেবিসাইট"-পন্থীদেরও
স্তানের পক্ষপাতী নয়। তবে যে
ছে, তাহা আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শের
দর যাহাই থাকুক, পাকিস্তানের নাম
তাহাদের পক্ষেও সম্ভব হইবে না।
ার মনও এতই বিরূপ। পাকিস্তানের
লক্ষ্য করিয়াছি।

ল্যের পথে

ভূমিব্যবস্থা সংস্কার, রাস্তাঘাট নির্মাণ,
কে আশান্বিত করিয়াছে। বিদেশী
সরকার হইতে যে ব্যাপক প্রচার

চলিতেছে, তাহার সাফল্য লক্ষ্য করিবার মতই। টুরিস্ট আগমনের অর্থই কাশ্মীরের সর্বশ্রেণীর শিল্পী ও ব্যবসায়ীর আর্থিক লাভ। এই সব কিছুর সামগ্রিক ফলই সরকারকে অনেকটা জনপ্রিয় করিয়াছে।

শেখ্ আবদুল্লার ডিগবাজী

দীর্ঘকাল আটক থাকার পর ১৯৫৮ সালে কুদ জেল হইতে শেখ্ আবদুল্লা মুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আটকের পূর্বে "স্বাধীন" হইবার যে লোভ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহাই তাঁহাকে পরেও ভারত-ভুক্তির বিরোধী করিয়া রাখে। সহকর্মীদের উপর শেখ্ আবদুল্লা অধিকতর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠেন। মুক্তির পরে তাঁহার এই মতিগতি অধিকতর উৎকট আকারে দেখা দেয়।

পাকিস্তান এবারে আবদুল্লার পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এককালের পাকিস্তানের দুষমন আবদুল্লার দুঃখে পাকিস্তান বেসামাল। যে আবদুল্লা একদিন ভারত-ভুক্তির প্রধান উদ্যোক্তা, যাহার আমলের গণপরিষদ ভারত-ভুক্তি চরম বলিয়া সমর্থন করে, সেই আবদুল্লা পাকিস্তানের সঙ্গে সুর মিলাইয়া নূতন ভাবে প্লেবিসাইট তথা গণভোটের দাবীদার। পাকিস্তান আক্রমণে বিপন্ন কাশ্মীর উদ্ধারকল্পে ভারতের সে-দিনের অভিযানকেও আবদুল্লা আজ সাম্রাজ্যবাদী অভিযান বলিতে লজ্জাবোধ করেন না। কিন্তু আক্রান্ত কাশ্মীর রক্ষার প্রয়াসকে মহাত্মা গান্ধী কি চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নোক্ত উক্তিতে সুস্পষ্ট ঃ

'It was right on the Union Government to rush troops, even a handful, to Srinagar. The result was in the hands of God. I would not shed a tear if the little Union Force is wiped out like Spartans, bravely defending Kashmir, nor will I mind Sheikh Abdullah and his Muslim, Hindu and Sikh comrades, men and women dying at their post in defence of Kashmir.'—Gandhiji; Oct. 30, 1947

মুষ্টিমেয় সৈন্য সংখ্যা হইলেও ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে শ্রীনগরে দ্রুত সৈন্য প্রেরণ করা উচিত। ফলাফল ভগবানের হাতে। কাশ্মীর রক্ষা করিতে গিয়া ভারতীয় সৈন্যগণ যদি স্পার্টানদের মত সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নও হইয়া যায় তাহা হইলেও আমি একবিন্দু চোখের জল ফেলিব না, তেমনি শেখ্ আবদুল্লা এবং তাঁহার মুসলমান হিন্দু ও শিখ সহ-কর্মিগণ স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে কাশ্মীর রক্ষার দায়িত্ব পালন করিবার কর্তব্যে রত থাকিয়া যদি সকলে মৃত্যুবরণ করেন তাহাতেও আমি দুঃখিত হইব না।—গান্ধীজী; অক্টোবর ৩০, ১৯৪৭

ভারতের অন্তর্ভুক্ত আক্রান্ত কাশ্মীর রক্ষায় ভারতের দায়িত্ব কত মহান ও অপরিহার্য ছিল, সত্য ও অহিংসার পূজারী মহাত্মাজীর উপরোক্ত উক্তিই উহার অকাট্য প্রমাণ।

মিঃ জিন্নার প্রয়াস সম্পর্কে ১৯৪৭ সালে ৩০শে সেপ্টেম্বর শেখ্ আবদুল্লা বলেন: "How can the Muslim League or Mr. Jinnah tell us that we should accede to Pakistan? They have always opposed us in every struggle. Even in our present struggle (Quit Kashmir), he carried on propaganda against us and went on saying that there was no struggle of any kind in the State. He even named us goondas." আক্রমণের পরে ১৯৪৭ সালের ১২ই নভেম্বর শেখ্ আবদুল্লা বলেন: "I shall beg all over the world and shall not rest content until every Hindu and Muslim is resettled...No one has besmirched the name of Islam to such an extent as the raiders from Pakistan who came in the name of Islam." তাঁহারই উক্তি: 'কাশ্মীর উদ্ধারের নামে আসিয়া পাকিস্তান ৬ লক্ষ কাশ্মীরী হিন্দু-মুসলমানকে গৃহছাড়া কপর্দকশূন্য করিয়াছে।'

আবদুল্লার অপর উক্তি

"মিঃ জিন্নার দুই জাতি তত্ত্বের থিওরীর সমাধি রচিত হইয়াছে কাশ্মীরেই। বিশ্ব দেখিয়াছে, পাকিস্তান হইতে প্রেরিত মুসলমান আক্রমণকারী, নারী নিগ্রহকারী, হত্যাকারী দলের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের মুসলমান নর-নারীই সংগ্রাম করিতেছে।"

১৯৪৭ সালের ১৬ই নভেম্বর শেখ্ আবদুল্লা বলিতেছেন, "কাশ্মীর-বাসীদের নামে বিশ্ববাসীকে বিশেষ করিয়া মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রগুলিকে আমি আমন্ত্রণ করিতেছি, তাঁহারা কাশ্মীরে আসিয়া দেখুন—পাকিস্তান ইস্‌লামের নামে মুসলমানদের বন্ধু সাজিয়া আসিয়া সেই মুসলমানদেরই কিভাবে সর্বনাশ করিয়াছে।" আরও বলেন: "These raiders abducted women. They massacred children. They looted everything and every one. They even dis-honoured the Holy Quoran and converted mosques into brothels..." কিন্তু চরম বিস্ময়, এই শেখ্ আবদুল্লাই বিপরীত কথা বলিতে পারিতেছেন। মুক্তির পরে তাঁহার উক্তিগুলি পুরাতন সহকর্মীদের বিরুদ্ধে জ্বালাময় ও বিদ্বেষপূর্ণ। তিনি বর্তমানে 'কাশ্মীর ষড়যন্ত্র মামলার' আসামী, মামলা চলিতেছে।

ব্যথিত কাশ্মীর

দীর্ঘকালের বিদেশী শাসনে, পেষণে ও শোষণে কাশ্মীর হতমান হইয়াছে। বিদেশীরা আসিয়া সকলেই রাজত্ব করে নাই, অনেক বিদেশী আক্রমণকারী শুধু লুণ্ঠন করিয়াছে; যাহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই, তাহা ভাঙিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে। কেহ বা নিজের খুশিমত ভাঙিয়া গড়িয়াছে। ভারতেও এত অধিক রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথের—'রণধারা বাহি...' উক্তিগুলি কাশ্মীর সম্পর্কে বুঝি বেশী প্রযোজ্য।...কাশ্মীরে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব আসিয়া পড়ায় অধিবাসীদের সামঞ্জস্য ও সহনশীলতার পাঠ

লইতে হইয়াছে। কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলমানের আচাররীতি ও উৎসবাদির মধ্যেও তাহা লক্ষ্য করা যায়।

ভৌগোলিক কারণে পথের দুর্গমতা ও প্রতিবন্ধকতার দরুন কাশ্মীরকে অনেকটা স্বতন্ত্র থাকিতে হইয়াছে। একটা স্বতন্ত্র কাশ্মীরী চেতনা বহুদিন ক্রিয়া করিয়াছে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ—ইহা স্বীকৃত সত্য হইলেও পুরাতন অভ্যাসবশত কোন কোন সরকারী কর্মচারীর মুখেও এমন কথা শোনা গিয়াছেঃ এই গাছ, এই বস্তু কাশ্মীরেই পাইবেন, ভারতে পাইবেন না। বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই রাজ্যের আমরা হইলে বলিতামঃ এই বস্তু শুধু আমার প্রদেশেই পাইবেন, ভারতের আর কোথাও পাইবেন না। —অবশ্য ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর কোন নেতার মুখে এমন কথা শোনা যাইবে না। এই অভ্যাসও বদলাইবে। যে-কারণে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র থাকিতে হইয়াছে, বানিহাল টানেল চালু হওয়ায় তাহা আর থাকিবে না, ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কার্যকারণে বাস্তব হইয়া উঠিবে। ফলে প্রাদেশিকতা-বোধ—তাহা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও আছে—কখনো দেখা দিলেও—ক্রমে অখণ্ড ভারতের চেতনা সত্য হইবে।

শ্রীনগর ত্যাগ করিবার পূর্বে বিখ্যাত গুল্‌মার্গ, খিলেনমার্গ (১৩ হাজার ফুট) দেখিতে যাই। পথে মানসবল লেকও দেখি। মানসবলের যে চিনার গাছের ছায়ার বেদীতে বেগম নূরজাহান সহ জাহাঙ্গীর বসিতেন—দূর হইতেই তাহা দেখিলাম। শিকারার মাঝি লইয়া যাওয়ার আগ্রহ দেখাইলেও সময়ের অভাবে গেলাম না। গুল্‌মার্গে দিল্লীবাসিনী বাঙালী মহিলা শ্রীমতী মায়া গুপ্তা স্বামীপুত্রসহ চেঞ্জে আসিয়াছেন। আমাকে বিশেষ অনুরোধ করায় তাঁহাদের হোটেলে চা খাইতে যাইতেই হইল। নিজের তৈয়ারী কেক্‌ও দিলেন। বিভিন্ন কাগজে গল্পাদি লেখেন। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ দেখিলাম। গুল্‌মার্গের ও খিলেনমার্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পরিবেশ অতি মনোরম। সন্ধ্যার পরে গুল্‌মার্গ হইতে শ্রীনগরে ফিরিলাম। পথে এক স্থানে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া মনে হইল, আকাশ কত কাছে নামিয়া আসিয়াছে।

শ্রীনগর হইতে পাহালগাম গেলাম। প্রায় আট হাজার ফুট উঁচুতে। পাহালগামের দৃশ্য অতি মনোরম। হোটেলের জানালা হইতেই পাহাড়ে বরফ জমিয়াছে দেখা গেল। সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগেই বেশ শীত। দোকানীরা তখনই শীতের ভয়ে মালপত্র গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। লীডার নদীর ও চারিদিকের পাহাড়ের সে কী শোভা!

গুহাভ্যন্তরে স্বয়ম্ভূ তুষারদেহ অমরনাথজী। প্রচলিত বিশ্বাস, এই তুষার লিঙ্গ আপনি শ্রাবণ পূর্ণিমায় পূর্ণরূপ ধারণ করে।

স্থানীয় অধিবাসীদের দারিদ্র্য এখানেও লক্ষ্য করিয়াছি। টুরিস্টদের ঘোড়াচড়ানোই প্রধান জীবিকা। তাহা আর কয় মাস! একটু ঘোড়ায় চড়ুন, বলিয়া ওদের কি কাকুতিমিনতি। একজনের করুণ আবেদনে কিছুটা অভিভূত হইয়া আমাকে ঘোড়ায় চড়িতেই হইল। পাহালগাম হইতে অমরনাথ (১৪ হাজার ফুট) মাত্র ৩৫ মাইল। দুর্গম পার্বত্য পথ। সেপ্টেম্বরে যাওয়া অসম্ভব বলিয়া দূর হইতেই প্রণাম জানাইলাম।

ফিরতি পথে

জম্মু ফিরিয়া বিশ্ববিখ্যাত বাখ্‌রা-নাঙ্গাল বাঁধ দেখিতে গেলাম। শতদ্রু নদীর প্রবল জলধারাকে সেচ ও বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের

পাহেল গ্রামের দৃশ্য

কার্যে লাগাইবার অভূতপূর্ব প্রয়াস। বাখ্‌রা বাঁধ পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ—৭০০ ফুট। তিনটি কুতব মিনারের সমান উঁচু। বাখ্‌রা নাঙ্গাল শহর (শহর এই উপলক্ষেই গড়িয়া উঠিয়াছে) হইতে ৭ মাইল দূরে। ভারত বাখরা-বাঁধের দ্বারা পাকিস্তানের পক্ষে নদীর জল পাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, এই অর্থহীন অভিযোগও পাকিস্তান করিয়াছে। প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম ও বর্ষায় শতদ্রুর জলপ্রবাহের শতকরা ৯০ ভাগ অহেতুক সমুদ্রে গিয়া থাকে, ইহা জলের অপচয়। যে জলটা এইভাবে নষ্ট হইত; তাহাই এক বিশাল জলাধারে সুরক্ষিত হইতেছে। নদীর গতিপ্রবাহ ভিন্ন খাতে সুরঙ্গের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। পূর্তবিদ্যার অভিনব বিস্ময়। কয়েক মাইল দূরের নদী হইতে পাথর-বালি-মাটি যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তুলিয়া আনা হইতেছে। মেশিনেই ধোয়া বাছাই, ছোট-বড়-মাঝারি হিসাবে চাঁকা হইতেছে। বিভিন্ন প্রণালীর মধ্য দিয়া পরিশেষে শ্রেষ্ঠ কংক্রিট তৈয়ারী হইতেছে। ১৭০০ ফুট উর্ধ্বে এই বাঁধের পাহাড়ের চূড়া। পাহাড় যাহাতে কালে ধ্বসিয়া না যায়, উহাতে ফাটল দেখা না দেয়, সেজন্যে কর্মিগণ বিপজ্জনক অবস্থায় পাহাড়ের দুর্বল দেহস্থান সিমেণ্ট দিয়া মজবুত করিতেছে। বৈজ্ঞানিক নই—এই কার্যের সবটা খুঁটিনাটি বুঝিতে পারি না। ভারতের উন্নয়নকল্পে যে মহান যজ্ঞানুষ্ঠান চলিতেছে, অফিসার ও কর্মিগণ যে নিষ্ঠা ও তৎপরতা দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন—তাহা বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া কর্মিগণের প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া পারি নাই।

১ লক্ষ কামরা বিশিষ্ট ৬০ তলা বাড়ির মত উঁচু বিরাট এই বাখ্‌রা ড্যাম এশিয়ার মধ্যে সুবৃহৎ। যে জলাধার বা লেক নির্মিত হইয়াছে তাহা দৈর্ঘ্যে ৫৫ মাইল। ইহাতে কতটা জল ধরিবে তাহার বৈজ্ঞানিক বা পারিভাষিক পরিমাণ আমাদের বোধগম্য নহে। তাই বলা হয় যে, গোটা ভারতের গৃহস্থালীর কাজে এক বৎসরে যে জল আবশ্যক, —এই জলাধারে তাহা আছে। বাখ্‌রা ড্যাম প্রস্তুত করিতে কী পরিমাণ কংক্রিট লাগিয়াছে ও লাগিবে তাহা ধারণার অতীত। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতি ঘণ্টায় ৪০০ টন উৎকৃষ্ট কংক্রিট তৈয়ারী

হইতেছে। এই হারে প্রতিদিন কংক্রিট তৈয়ারী হইতে থাকিবে ৪ বৎসর ধরিয়া।

বিষুবরেখায় পৃথিবী ঘুরিয়া গেলে যে দৈর্ঘ্যের মাপ মিলে অতটা ৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা তৈয়ারী করিতে যতটা কংক্রিটের প্রয়োজন, এই বিরাট বাঁধ সম্পূর্ণ করিতে ততটা কংক্রিটের প্রয়োজন হইবে।

সেচ কার্যের জন্য বাখ্‌রা নাঙ্গালে যে ক্যানেল নির্মিত হইয়াছে তাহা দৈর্ঘ্যে ৬৯০ মাইল। এই ক্যানেল হইতে শস্য-ক্ষেত্রে জল সরবরাহের জন্য যে-সব নালা গিয়াছে তাহার পরিমাণ ২১০০ মাইল। ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার একর নূতন কৃষিক্ষেত্রে এখান হইতে জল সরবরাহ হইবে। ইহা ছাড়া পুরাতন সেচ প্রণালীর যে উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহার পরিমাণ ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার একর।

বাখ্‌রা জলাধার বা লেকের—গভীরতা ৫৪০ ফুট—প্রচণ্ডতম চাপ সহ্য করিবার যোগ্য বাঁধ কী পরিমাণ মজবুত হওয়া প্রয়োজন তাহা অনুমেয়! পর্বতগাত্রকে মজবুত করা হইতেছে। বাঁধের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য শীতকালের শুষ্কপ্রায় নদীরও ১৮০ ফুট নিচু হইতে বাঁধের ভিত্তি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধানের পর ১৯৪৮ সনে স্থান নির্ধারিত হইয়া বাখ্‌রা ড্যাম প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হয়। যাতায়াতের রাস্তাঘাট, মালপত্র বহিবার জন্য রেল লাইন তৈয়ারী, কর্মীদের বাসস্থান, জল সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা—কত শত প্রাথমিক কাজ সুসম্পন্ন করিতে হয়।

বাখ্‌রা ড্যাম-এ বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার অফিসার মিঃ খান্না বিশেষ যত্ন ও ধৈর্যের সহিত সব দেখাইলেন—বুঝাইলেন। ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল—আমাদের অবৈজ্ঞানিকদের কৌতূহল নিবৃত্তি এবং আনাড়িসুলভ প্রশ্নাদির উত্তর দানের জন্য। নিতান্ত সহজ ভাষায় ও দৃষ্টান্তে সব বুঝাইয়া বলিবার অসাধারণ নৈপুণ্য ভদ্রলোকের আছে দেখিলাম। মিঃ খান্না চায়ের টেবিলে আমাদের বলিলেন, "এখানকার কর্মীরা বস্তুতই দুঃসাধ্য কর্ম অতিশয় তৎপরতার সহিত (নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই) করিয়া যাইতেছে। 'দেশের উন্নতির জন্য কাজ করিতেছি'—কর্মীদের

মধ্যে এই প্রেরণাই কাজ করিতেছে। তাহাদের শ্রমনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, নূতন নূতন যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য এই আগ্রহ সম্পর্কে আপনারাও আমাদের দেশবাসীকে অবহিত করাইবেন—আশা করি।” নাঙ্গালে শতদ্রুর তীরে সুরম্য স্থানে, যাঁহারা বাখ্‌রা ও নাঙ্গাল পরিকল্পনায় প্রাণ দিয়াছেন, আহত হইয়াছেন, সেই সকল কর্মীর নাম-ফলকে শ্রদ্ধা ও সম্মানসূচক লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। নাঙ্গাল জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে দিল্লীতে এবং অন্যত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। বিখ্যাত জার্মান ফার্ম হইতে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আনিয়া এখানে বসান হইয়াছে। যন্ত্রপাতি বসাইবার সময় জার্মান বিশেষজ্ঞগণ আসিয়াছিলেন। বর্তমানে ভারতীয় বিজ্ঞানিগণই যাবতীয় কার্য পরিচালনা করিতেছেন। বাখ্‌রায় ৩০.৩২ জন বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন—বর্তমানে আছেন ৫।৬ জন। এমন সব যন্ত্রপাতি আসিয়াছে ও বসিয়াছে, যেগুলি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারগণ হাতেকলমে পূর্বে চালান নাই। দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন, “এমন ক্রেন আসিয়াছে, যাহাতে আমরা অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ নই।” বর্তমানে সব কিছুই ভারতীয়গণ আয়ত্ত করিয়াছে এবং পরিচালনা করিতেছে। নাঙ্গাল বাঁধ ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তৈয়ারী খালের দৃশ্য দেখিয়া চোখ জুড়ায়। নদীর ৬৭ ফুট নীচে সুরঙ্গ আকারে রাস্তা, গ্যালারি না দেখিলে কল্পনা করাই যায় না। দেখিলেও আমাদের পক্ষে উহার সমস্তটা বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব বুঝা শক্ত।

বাখ্‌রা নাঙ্গাল দেখার পর শ্রীনেহরু তাঁহার যে সুন্দর অনুভূতিটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

“I look upon these works as temples and place of pilgrimage and I feel more religious-minded when I visit them.”

ভারতে যে-কোন লোককেই বাখ্‌রা নাঙ্গাল দেখিয়া স্বীকার করিতে হইবে, ‘হ্যাঁ, তীর্থই ঘুরিয়া গেলাম।’

শুধু ইহাই বলিতে ইচ্ছা করে—আমাদের ছাত্র ও যুবকগণ বাখ্‌রা নাঙ্গাল দেখিবার সুযোগ লাভ করুক। সহস্র বাক্য অপেক্ষা একটি

কাজের মূল্য যখন অধিক, তখন ভারতবাসীর এই বিরাট কর্মোদ্যম দেখিয়া কর্মশক্তির প্রতি তাহাদের অপার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হইবেই।

আনন্দপুর

নাঙ্গাল দেখিয়া আনন্দপুর আসিলাম। এই সেই (কেশগড়) আনন্দপুর, যে স্থান নবম শিখ গুরু তেগ বাহাদুর ও দশম গুরু গোবিন্দের কর্মভূমি ও জন্মভূমি। শিখদের একটি প্রধান ধর্মস্থান। খাল্‌সাপন্থের জন্মস্থান এই আনন্দপুর। কাশ্মীর ইতিহাসের সঙ্গে এই আনন্দপুর ও গুরু তেগ বাহাদুরের দুঃখ বেদনা ও আত্মত্যাগের স্মৃতি জড়িত। আনন্দপুরে শিখদের বিরাট ধর্মমন্দির বস্তুতঃই দেখিবার মত। আমরাও 'প্রাণ ভরিয়া' সব দেখিলাম। ত্রিতলের প্রশস্ত এক কক্ষে বা হলে দেখিলাম গুরু গোবিন্দের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র। শুনিলাম প্রতি অস্ত্রের ইতিহাস। একজন শিখ ওখানে কর্তব্যরতই থাকে। সে-ই গোটা ইতিহাস মুখস্থ বলিয়া যায়। প্রতিদিন বলিতে বলিতে মন্ত্রের মতই তাহা মুখস্থ হইয়া গিয়াছে মনে হইল।

গুরু তেগ বাহাদুরের সময়ে ভারতবর্ষে ঔরংজেব হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিবার জন্য সর্বপ্রকার জোরজুলুম চালাইতেছেন। কাশ্মীরে হিন্দুদের উপর নিগ্রহ চরমে উঠিয়াছে। প্রাণের দায়ে ও মানের দায়ে বহু হিন্দু ধর্মত্যাগ করিতেছে। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন: ঔরংজেব সিংহাসন লাভের জন্য পিতাকে বন্দী ও ভ্রাতাদের হত্যা করেন, এই ভ্রাতৃহত্যার কলঙ্ক ও গ্লানি ঢাকিবার উৎকট আগ্রহে অভাবিত নূতন উদ্যমে হিন্দুদের উপর নিগ্রহ চালাইয়া মুসলমানদের সন্তোষসাধন করিতে চেষ্টা করেন। সম্রাট ঔরংজেবের প্রতাপে সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান হইতেছে, ইহা দেখিয়া ও শুনিয়া গোঁড়া মুসলমানগণ ঔরংজেবের সমর্থক হইয়া উঠে, তাঁহার পিতৃনিগ্রহ ও ভ্রাতাদের হত্যা রূপ পাপকার্যও তাহাদের নিকট একেবারেই তুচ্ছ হইয়া যায়। তেগ বাহাদুর আনন্দপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল

পরিভ্রমণে বাহির হন। হিন্দুদের মধ্যেও আশার বাণী প্রচার করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণান্তে গুরু তেগবাহাদুর আনন্দপুরে ফিরিয়া আসিতেই কাশ্মীর হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসিয়া গুরু তেগ বাহাদুরের শরণাপন্ন হন, এবং কাশ্মীরে ধর্মান্তরিত করার জন্য হিন্দুদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হইতেছে, অশ্রুজলে তাহারই বিবরণ দিয়া বলেন,—'আপনি আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা করুন।' তেগ বাহাদুর কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণের নিকট অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া মর্মাহত হইয়া বলেন ঃ 'দেখিতেছি, মহাপ্রাণ পবিত্রহৃদয় গুরু অর্জুনদেবের মত আর একটি বলি না হইলে, এই সকল অত্যাচারীদের হৃদয়ের পরিবর্তন হইবে না। আর একটি মহাপ্রাণ বলির প্রয়োজন।' কথিত আছে, ঐ সময় নিকটে ছিলেন গোবিন্দ (পরে গুরু গোবিন্দ সিংহ), নয় বৎসরের বালক ; গোবিন্দ পিতাকে বলেন ঃ 'পিতঃ, আপনার চাইতে অধিক পবিত্র, অধিক মহৎ আর কে আছে ?" পুত্র গোবিন্দের মুখে এমন নির্ভীক উক্তি শুনিয়া গুরু তেগ বাহাদুর অত্যন্ত সন্তোষলাভ করেন এবং গোবিন্দের ভাবীজীবন ও যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হন। অতঃপর কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদের সম্বোধন করিয়া গুরু তেগ বাহাদুর বলেন ঃ 'আপনারা ফিরিয়া আপনাদের মুসলমান শাসককে অথবা সম্রাটকে গিয়া বলুন ঃ "যদি তেগ বাহাদুর ইস্‌লাম গ্রহণ করেন, তবে আমরাও ইস্‌লাম কবুল করিব।" ' তেগ বাহাদুরের এই উক্তির সংবাদ কানে পৌঁছিতেই সম্রাট ঔরংজেব একেবারে আগুন হইয়া উঠেন— এতো বড় স্পর্দ্ধা ! তেগ বাহাদুরের উপর পরোয়ানা আসে, অবিলম্বে দিল্লী যাইতে হইবে। * * * পরবর্তী ঘটনা ইতিহাসের শোকাবহ কাহিনী। প্রকাশ পাইল একদিকে সম্রাট ঔরংজেবের নিষ্ঠুরতম বর্বরতা, আর একদিকে বিবেক ও সত্যনিষ্ঠার অনির্বাণ তেজের মহিমা। তেগ বাহাদুরকে ধর্ম ত্যাগ করানো সম্ভব হইল না, সম্ভব হইল তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ। দিল্লীর চাঁদনী চকে, যেখানে গুরু তেগ বাহাদুরের মস্তকচ্ছেদ করা হয় (১৬৭৫), সেখানে বর্তমানে রহিয়াছে বিখ্যাত শিখগঞ্জের গুরুদ্বার। তেগ বাহাদুরের ছিন্ন মুণ্ড জনৈক শিখ (ভাই জইতা)

আনন্দপুরে বহন করিয়া আনেন। তেগ বাহাদুরের এই ছিন্ন মুণ্ডই আনন্দপুরে সমাহিত করা হয়।

এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ খাল্‌সা-পন্থের ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। শান্তিপূর্ণ শিখ ধর্ম ও নীতি কেমন করিয়া আত্মরক্ষার প্রয়োজন বোধে ক্ষাত্র-শক্তির সাধনায় অগ্রসর হয় তাহাও বুঝিবার। গুরু নানকের নব ধর্মের সাম্য ও ভগবদ্বিশ্বাস জনগণকে আকৃষ্ট করিতে থাকে। দল পুষ্ট হইতে থাকে। তখন পর্যন্ত এই দল বিশ্বাসী ও সাধকদেরই দল। গুরুগণ ধর্মপ্রচার করিতে থাকেন। নব ধর্মের পক্ষে 'গুরু'গণ অপরিহার্য হইয়া উঠেন। গুরুগণ জাঁক-জমকের সহিত দীক্ষিতগণকে লইয়া দরবারে বসিতেন। দরবারে উপদেশই বর্ষিত হইত। কিন্তু তথাপি উহা দরবারই; যেন বাদশাহী দরবারের বিকল্প। দরবারের জাঁকজমক দেখিয়া এবং এই নূতন ধর্মে লোক দীক্ষিত হইতেছে, এমনকি মুসলমানও অনেকে দীক্ষিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া মুসলমান রাজপুরুষগণ রুষ্ট ও বিচলিত হইয়া উঠেন। নিগ্রহ আরম্ভ হয়। জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট তখনকার ধর্মপ্রাণ গুরু অর্জুনদেবের (তিনি আদি গুরু গ্রন্থসাহেব লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন, অমৃতশহরের স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করেন এবং তিনি ছিলেন পঞ্চম গুরু ১৫৬৩—১৬০৬) বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয় যে, গুরু অর্জুন বিদ্রোহী কুমার খস্‌রুর সাহায্যকারী। জাহাঙ্গীর গুরু অর্জুনকে লাহোরে যাইবার জন্য জরুরী পরোয়ানা পাঠান। গুরু অর্জুন পরিণাম স্পষ্টই দেখিতে পান। লাহোর রওনা হইবার পূর্বে তিনি পুত্র হরগোবিন্দকে পরবর্তী গুরু মনোনীত করিয়া, পুত্রকেই সম্বোধন করিয়া বলেন: 'আমরা গুরু নানকের ধর্ম ও আদর্শ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও অহিংসার পথেই প্রচার করিয়া চলিয়াছি। আমি শান্ত সমাহিত থাকিয়াই বিশ্বস্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি অনুরাগবশতঃ সব সহ্য করিব,—সর্ব দুঃখ বরণ করিব। কিন্তু ইহাতেও যদি মুসলমান সম্রাট ও তাহার অত্যাচারী শাসকগণের চিত্তের পরিবর্তন না আনিতে পারে—তাহারা এমন অমানুষই যদি হয়, তাহা হইলে—

অতঃপর নীরবে সব অন্যায় অত্যাচার সহ্য করা সঙ্গত হইবে না। সুতরাং তুমি এই গুরুর সিংহাসনে সশস্ত্র-দৃঢ়ভাবে বসিবে এবং শিখদের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রস্তুত থাকিতে নির্দেশ দিবে।"

গুরু অর্জুনকে লাহোরে লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করা হইল এবং নৃশংস অত্যাচার চালাইয়া হত্যা করা হইল (মে ৩০, ১৬০৬)।

হরগোবিন্দ (৬ষ্ঠ গুরু) স্পষ্টই অনুভব করিলেন যে ধর্মের জন্য শিখদের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন, তাহাদের নীরবে সব অত্যাচার সহিয়া যাওয়ার ফলে অত্যাচারী শাসকদের হৃদয়ের কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই। তিনি পিতা অর্জুনদেবের নীরব আত্মবলি দেখিয়াছেন। তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগিল, এভাবে শিখ গুরু শুধু আত্মবলি-ই দিবে কি? না, ধর্মীয় গুরুকে শিখ অনুগামীদের রক্ষাও করিতে হইবে। তিনি শিখদের সাহসী সৈনিকরূপে সংঘবদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং ধর্মগুরুরূপে শিখদের শাসন-দায়িত্বও গ্রহণ করিলেন। বাদশাহী সেনাদের সঙ্গে কয়েকটা সংঘর্ষে তিনি জয়লাভও করিলেন। হর-গোবিন্দ শিখদের মধ্যে যে যোদ্ধৃজাতিসুলভ প্রেরণা আনিয়া দিলেন তাহাই তাহাদের ক্রমে সাধারণ হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিল। শিখ্ অর্থ-ই দাঁড়াইল যোদ্ধা—সৈনিক।

হরগোবিন্দের পরবর্তী দুই শিখ গুরুর আমলে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে নবম গুরু তেগ বাহাদুর জনৈক হিন্দুরাজার (বিলাসপুর) নিকট হইতে ৭০ হাজার টাকা দিয়া একটি গ্রাম ক্রয় করিয়া আনন্দপুর নামকরণ করেন এবং সেখানে যথাসম্ভব সুরক্ষিত ভবনাদি নির্মাণ করাইয়া লন।

তেগ বাহাদুরের মৃত্যুবরণের ঐতিহাসিক বিবরণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

অতঃপর দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের কথা। গুরু গোবিন্দ পিতার প্রাণদানের পর স্পষ্টই বুঝিলেন, হবে না হবে না, খোল তরবার··· তিনি লক্ষ্য করিয়া বেদনা বোধ করিলেন যে, মুসলমান শাসকদের

অত্যাচারে-নিপীড়নে লোকেরা বীর্যহীন হইয়া পড়িয়াছে; সত্য রক্ষার জন্যও কেহ বীর্যবত্তা দেখাইতে বা প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে না।

কোন কোন যুদ্ধে তাঁহার অনুগামী সৈন্যগণ যে প্রাণপণ করিয়া সত্যরক্ষার্থে সংগ্রাম করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহাও গুরু লক্ষ্য করিলেন। গুরু গোবিন্দ স্বীয় চেষ্টা ও উদ্যমে শুধু অধ্যয়নাদিই করেন নাই, শক্তিচর্চায় ও অস্ত্রচালনায় পারদর্শী হইলেন, অনুগামীদেরও যুদ্ধ-বিদ্যার্জনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

খাল্‌সা পন্থ

এক অভিনব নূতন প্রেরণা ও আদর্শ লইয়া গুরু গোবিন্দ (সাল ১৬৯৯, ১২ই এপ্রিল) আনন্দপুরে এক শিখ দেওয়ান (ধর্ম-সমাবেশ) আহ্বান করিলেন। এই বিশেষ দেওয়ানের আমন্ত্রণ পাইয়া দূর-দূরান্ত হইতে সহস্র সহস্র শিখ আসিয়া সমবেত হইল। বিরাট স্থান জুড়িয়া সম্মেলন মণ্ডপ নির্মিত হইল। দেওয়ানের একপাশে একটি তাঁবু নির্মিত হইল, তাহা চারিদিক হইতে আবৃত। শোনা গেল, স্বয়ং গুরু গোবিন্দ ঐ তাঁবুতে অবস্থান করিতেছেন। সম্মেলনের প্রারম্ভিক ভজনাদি সমাপ্ত হইল। সকলেই আশা করিল, এবার গুরু আসিয়া সকলকে দর্শন দিবেন, ধর্ম উপদেশ দিবেন। কিন্তু কোথায়, গুরুর যে দেখাই নাই। ক্রমে সকলেই অধীর হইয়া উঠিল গুরুকে দেখিবার জন্য। সকলের দৃষ্টি ঐ তাঁবুর দিকে।

অতঃপর সময় বুঝিয়া তাঁবু হইতে গুরু গোবিন্দ বাহির হইলেন, হস্তে এক শাণিত তরবারি। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, আকৃতি অতি কঠোর! হস্তধৃত তরবারি উর্ধ্বে তুলিয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, আমার প্রিয়তম শিখগণের মধ্যে এই সভাস্থলে এমন কেহ কি আছে যে ধর্মের জন্য এই তরবারির নীচে স্বীয় মস্তক পাতিয়া দিতে পারে? গুরুর ঐ প্রকার মূর্তি ও হস্তে তরবারি দেখিয়া সকলেই নির্বাক। কেহই কোন কথা বলিল না। গুরু গোবিন্দ পুনরায় আহ্বান জানাইলেন। তবু কেহ সাড়া দিল না। এবারে তৃতীয় আহ্বান আসিল: "তবে

কি তোমাদের গুরুর এই উন্মুক্ত তরবারি বৃথাই যাইবে, পুনরায় কোষবদ্ধ হইবে? কোন বীর জননীর সাহসী সন্তান কি কেহই নাই, যে ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে?" এবারে একজন দাঁড়াইয়া জোড় হস্তে দ্বিধাহীন বিনম্র কণ্ঠে বলিলেন: "প্রভু এই আমার শির আপনার কাজের জন্য দিতেছি।" ইনি লাহোরের এক সামান্য ক্ষত্রী দয়ারাম। গুরু গোবিন্দ "ভাল বলিয়াছ দয়ারাম, তুমি ধন্য" বলিয়াই দয়ারামের হাত ধরিয়া পূর্বোক্ত তাঁবুর অভ্যন্তরে তাঁহাকে লইয়া গেলেন! সমবেত শিখগণ ভীত ও হতবাক্ হইয়া রহিল। এমনই সময় তাঁবুর ভিতরে কোন দেহের উপর সজোরে তরবারি নিপতিত হইবার শব্দ শোনা গেল, আর তাঁবুর অভ্যন্তর হইতে টাট্‌কা রুধির বহির্গত হইতে লাগিল। কোনই সন্দেহ রহিল না যে, ভাই দয়ারাম নিহত হইল।

মুহূর্তকাল পরেই গুরু তাঁবু হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এবার হাতের তরবারি টাট্‌কা রুধিরলিপ্ত! গুরু গোবিন্দ বলিতে লাগিলেন: ভাই দয়ারাম ধন্য! তাঁহার অধিক খাঁটি শিখ আর কে? কিন্তু আরও একটি বলি চাই। এবার কে নিজেকে বলি দিবে এসো!

সমবেত শিখগণ প্রমাদ গণিল। তাহারা তো শির দিতে আসে নাই। তাহারা অধিকাংশই আসিয়াছে উৎসব-আনন্দে যোগ দিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে, ভজন গান গাহিতে ও শুনিতে এবং পবিত্র প্রসাদ খাইতে। তাহারা সভয়ে বুঝিল গুরু উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। ভয়ে ভীত হইয়া ভাবিল, এই সম্মেলনে আসিয়াই ভুল করিয়াছে। গুরু গোবিন্দ তৃতীয়বার ডাক দিতে দিল্লীর এক জাট ধরমদাস গললগ্নীকৃতবাসে জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"মহামান্য গুরু, আমি আপনার অধম ভৃত্য ধন্য হইব, যদি আপনার তরবারি আমার মস্তক ছিন্ন করে।" গুরু ধরমদাসকে ধরিয়া পূর্ববৎ তাঁবুতে লইয়া গেলেন এবং পূর্ববৎ ঘটনা ঘটিল। সমবেত শিখগণ বিস্মিত হইল, জানিয়া শুনিয়া ধরমদাস বলি পড়িতে গেল! তাঁহারা গুরু গোবিন্দের জননীর নিকট দৌড়াইয়া গেল, 'আপনি আসিয়া রক্ষা

করুন, নয়তো গুরুর অবিবেচনায় নিরপরাধ শিখগণ সকলেই নিহত হইবে।' অনেকে ভয়ে সরিয়া পড়িল। গুরু গোবিন্দের জননী পুত্রকে এমন কার্য হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াও পাঠাইলেন। কিন্তু গুরু গোবিন্দের আরো বলি চাই! এবার গুরুর আহ্বানে দ্বারকাবাসী রজক মোকমচাঁদ সাড়া দিলেন। গুরু তাঁহাকেও পূর্ববৎ তাঁবুতে লইয়া গিয়া পূর্বোক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। সমবেত জনতার অধিকাংশই ভয়ে পলাইতে লাগিল; বলিতে লাগিল উন্মাদ-গুরু সকলকেই হত্যা করিবেন। এবার বিদরের ক্ষৌরকার সাহিবচাঁদ শির দিতে আগাইয়া আসিলেন; "আমার মস্তক আপনার, ইহা লইয়া যাহা ইচ্ছা করুন।" গুরু গোবিন্দ সাহিব-চাঁদকে লইয়া তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন এবং পূর্ববৎ কিছুক্ষণ পরে নূতন রুধিরলিপ্ত তরবারি হস্তে ফিরিয়া আসিলেন। আরো বলি চাই। এবার শেষ বা পঞ্চম ডাকে সাড়া দিয়া উঠিলেন, বারিবাহি হিম্মৎ রায়। গুরু যথাপূর্বং হিম্মৎ রায়কে তাঁবুতে লইয়া গেলেন। তাঁবু হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া সম্মেলন স্থলে আসিয়া পড়িতেছে!

এই সময় গুরুর সংকেতে তাঁবুর পর্দা উত্তোলিত হইল। সকলে বিস্ময়ে দেখিল, পূর্বোক্ত পাঁচজনই নূতন গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া যেন এক নবজীবনের মহিমা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহারা সকলেই তরবারি হাতে করিয়া সভামঞ্চে আসিলেন এবং গুরুকে নত মস্তকে বন্দনা করিলেন। সভাস্থ সকলে নিহত পাঁচজন বীরকে পুনরায় জীবিত দেখিয়া যেমন আনন্দিত হইল, তেমনি বিস্মিত হইল। চক্ষুজলে তাহাদের গণ্ড ভাসিতে লাগিল। এবার গুরু গোবিন্দ সমবেত শিখদের বলিতে লাগিলেনঃ 'প্রিয় শিখগণ, তোমরা সুখী হও। এই পঞ্চ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা আমার প্রতি যে অপূর্ব অনুরক্তি দেখাইয়াছেন, তাহার ফলে আমি তাঁহাদের জন্য আমার নিজ জীবন বলি দিতে প্রস্তুত। তাঁহারা ও আমি একপ্রাণ, অভেদ। যদি কেহ ইহাদের সঙ্গে আমার কোন প্রভেদ কল্পনা

করে, তাহারা অত্যন্ত ভুল করিবে। তোমাদের সকল বিস্ময় অপনোদন করিবার জন্য বলি : 'পরীক্ষা গ্রহণের জন্য আমি তাঁবুতে ইহাদের পরিবর্তে পাঁচটি ছাগ বলি দিয়াছিলাম।'

তখন সমবেত শিখগণ লজ্জায় অধোবদন হইলেন, অনেকে অনুতাপ প্রকাশ করিয়া গুরুর নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা এখানে মুখ দেখাইতে লজ্জাবোধ করিতেছি : আমরা দুর্বল ভীরু। আমরা এখন নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছি : আমরা আপনার পদানত রহিয়াছি—যে কোন ত্যাগের জন্য এখন আমরা প্রস্তুত। গুরু গোবিন্দ বলিলেন, প্রিয় শিখগণ, ধৈর্য ধর। তোমাদের পরীক্ষার সময় আসিবে। আমরা শীঘ্রই পরধর্ম-পীড়ক অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে ধর্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিব। শত শত নয়, সহস্র সহস্র শিখের প্রয়োজন হইবে। এখন হইতে তোমাদের প্রত্যেকের শির গুরুর জন্য রক্ষা করিবে এবং দান করিবে। এই পাঁচজন সাহসী বীর শিখ যে ত্যাগ-নিষ্ঠার আদর্শ দেখাইলেন, তাহাই খাল্‌সা পন্থের আদর্শরূপে বিদ্যমান থাকিবে। গুরু গোবিন্দ বিবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিলেন, প্রাচীন 'চরণ পাখাল' অনুষ্ঠান বন্ধ করিলেন,—সর্ব ভেদ বুদ্ধি দূর করিলেন। আর কেহ গুরু নহে—খাল্‌সা পন্থই গুরুর স্থান অধিকার করিল। গুরু গোবিন্দ জলপাত্রে খড়্গ প্রবেশ করাইয়া আলোড়িত করিলেন—উহাই অমৃত। নব-দীক্ষার জন্য ঐ অমৃতবারি সিঞ্চনের রীতি প্রবর্তন করিলেন। নামের সঙ্গে 'সিংহ' যুক্ত হইল। আর তাহারা মেষশাবক নয়—সিংহশিশু।

আনন্দপুর (তখত্ কেশগড় সাহেব্) শিখ্ মন্দিরে প্রতিদিন উপাসনার পরে গুরু গোবিন্দের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি দেখান হয়, যথা—

১। হুজুরি খাঁড়া—দুই দিকেই ধার। ইহার দ্বারাই গুরু 'অমৃত' প্রস্তুত করিয়া তাঁহার প্রিয় পঞ্চ খালসাকে প্রথম দীক্ষা দান (ব্যাপটাইজড্ বলা যায়) করেন।

২। একটি তরবারি—ইহা সর্বক্ষণ গুরু ধারণ কারতেন।

৩। একটি বর্শা—কথিত আছে,এই বর্শা সজোরে প্রোথিত করিয়া একটি প্রস্রবণ বাহির করিয়াছিলেন।

৪। নাগিনী বর্শা—সর্পাকৃতি—মোগলের অধীন পার্বত্য রাজার সঙ্গে আনন্দপুরের যুদ্ধে ইহা ব্যবহৃত হয়। এই যুদ্ধে ভাই বাচিত্র সিং অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই বীরত্বের জন্য গুরু গোবিন্দ এই অস্ত্র তাঁহাকে দান করেন।

৫। সৈইত—(সোজা তরবারির আরবী)—এই তরবারি সম্রাট বাহাদুর সাহ আগ্রায় গুরু গোবিন্দকে উপহার দেন। কথিত আছে, এই তরবারি হজরত মহম্মদের জামাতা আলী ব্যবহার করিতেন।

৬। একটি (matchlock) সাবেকী বন্দুক—গুরু গোবিন্দের অনেক বীরত্বপূর্ণ স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।

* * *

নাঙ্গাল স্টাফ হোস্টেলে দুই দিন ছিলাম। হোস্টেল পরিচালক কী যত্নের সঙ্গে যে আমাদের কয়দিন খাওয়াইলেন, আপ্যায়ন করিলেন, বলিবার নহে!

আমাদের সাংবাদিক দলের ইনচার্জ ছিলেন শ্রীকমলকুমার। তিনি ও তাঁহার সহকারী শ্রীঅগ্নিহোত্রী (আমার দেওয়া নাম অগ্নিকুমার) এবং স্কোয়াড্রন লীডার মিঃ মালিক এই দীর্ঘ পরিভ্রমণকালে সর্বব্যাপারে, এমন কি আমাদের পর্বতপ্রমাণ লাগেজগুলি স্থানে স্থানে নামানো উঠানো—যাঁর যাঁর ঘরে পৌঁছানোর তদারক-কার্যে যেভাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন তাহা ভুলিবার নহে—আমরা যেন তাঁহাদের নিজেদেরই সম্মানিত অতিথি, এইভাবে, আমাদের সর্বপ্রকারে সুখসুবিধা বিধানের জন্য তাঁহারা যেরূপ সতর্ক ও যত্নপর ছিলেন তাহা চিরকাল স্মরণ রাখিবার।

পরিশিষ্ট

কাশ্মীরের দক্ষিণাংশ উপত্যকা ও সমতল ভূমি। হিমালয়ের দক্ষিণাংশে সুবিস্তৃত পীরপাঞ্চাল পর্বতমালা। পীরপাঞ্চাল ও সমতলভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে শুধুই সুউচ্চ রুক্ষ পর্বতশ্রেণী ও বনভূমি। ইহারই দক্ষিণাংশে রামনগর, উধমপুর, আখ্‌নুর, রাজৌরী, নওসেরা প্রভৃতি অবস্থিত; আর উত্তরাংশে কুদ্‌, ভাদ্‌রা, পাণিহাল, পুঞ্চ, কোট্‌লি, মীরপুর প্রভৃতি সহর। হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে আসিলেই কাশ্মীরের উপত্যকা-ভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। হিমালয়ের এই দিককার পর্বতশৃঙ্গ কোন কোন স্থানে ১৫ হাজার ফুট। বলা বাহুল্য, এই উপত্যকাভাগই অত্যধিক উর্বর ও ঘনবসতিপূর্ণ। শ্রীনগর সমেত এই অঞ্চলই প্রকৃত কাশ্মীর। দৈর্ঘ্যে এই উপত্যকা ৮৪ মাইল, প্রস্থে ৩০ মাইল। ঝেলাম, কিষণগঙ্গা ও সিন্ধু এই অঞ্চলে প্রবাহিত। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের মোট লোক-সংখ্যার ১৭'২৮৭০৫ লোক এই অঞ্চলে বাস করে। কাশ্মীর রাজ্যের উত্তরাংশ হিমালয় পর্বতের কারাকোরাম ও হিন্দুকুশ পর্বতমালার মধ্যবর্তী। এই অংশই গিল্‌গিট ও লাডাক এই দুই ভাগে বিভক্ত। লাডাকের উচ্চতা ১০ হইতে ২০ হাজার ফুট। গিল্‌গিট লাডাক হইতে অধিক উচ্চ নহে।

কাশ্মীরের অংশ গিল্‌গিট এমনই একটি স্থান যেখানে তিনটি রাষ্ট্র রাশিয়া, চীন ও তিব্বত মিশিয়াছে। বস্তুতঃ কাশ্মীর রাজ্যকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া আছে রাশিয়া, চীন, আফ্‌গানিস্থান, তিব্বত এবং পাকিস্থান ও ভারত। কাশ্মীরের ইহাও সমস্যা: উহার দক্ষিণাংশ পশ্চিম-পাঞ্জাব (পাকিস্তান) সংলগ্ন, এবং উহার পশ্চিমাংশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (পাকিস্তান) সংলগ্ন। অবশ্য দক্ষিণের কতক অংশ পূর্ব-পাঞ্জাবের (ভারত) সংলগ্ন বটে। কাশ্মীরে যাতায়াতের যে দুইটি পথ ছিল, তাহা পাকিস্তানের মধ্যে পড়িয়াছে। একটি নূতন পথ ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযোগ রক্ষা করিতেছে। এই রাস্তা চালু ও

নিরাপদ রাখিতে ভারতীয় বাহিনীকে তৎপর থাকিতে হইয়াছে এবং হইতেছে। গিল্‌গিটের পথেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযোগ রাখা সম্ভব। সামরিক প্রয়োজনে ১৯৩৫ সালে তদানীন্তন ভারত সরকার কাশ্মীর-রাজের নিকট হইতে গিল্‌গিট লীজ লইয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা ত্যাগ করার সময় ভারত সরকার গিল্‌গিট কাশ্মীরের রাজাকে প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালেই হানাদারগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিক হইতে আসিয়া গিল্‌গিট এলাকা দখল করিয়া লয়। তুষারাবৃত জোজিলা-পথ (ইহাই গিল্‌গিট যাওয়ার পথ) ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকর্তৃক উন্মুক্ত করা সম্ভব হইলেও যুদ্ধবিরতির চুক্তির দরুণ ভারতীয় সৈন্যের পক্ষে আর অগ্রসর হইয়া গিল্‌গিট উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং গিল্‌গিট এখনো পাকিস্তানের দখলেই রহিয়াছে। গিল্‌গিট শুধু কাশ্মীরের নয়, ভারতের নিরাপত্তার দিক্ হইতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। গিল্‌গিটে মিশিয়াছে রুশ ও চীন সাম্রাজ্য এবং তিব্বত।

* * *

পাকিস্তানী হানাদারগণ কাশ্মীরের বড় বড় সহর কিভাবে ধ্বংস করে—লুণ্ঠনে, অগ্নিদাহে, অত্যাচার ও নারীনিগ্রহে শ্মশানে পরিণত করে—তাহারই দৃষ্টান্ত হিসাবে শুধু বারমুলার কথা বলিতেছি। এই সহরের ১৪ হাজার অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ২ হাজার অত্যাচার হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পায়। পাকিস্তানী সশস্ত্র লুঠেরাগণ বারমুলার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে। ২৬০টি ট্রাক বোঝাই করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য (সেই সঙ্গে বহু নারীকেও) লইয়া যায়। নারীদের কানের ও হাতের অলঙ্কার ছিনাইয়া লয়। দোকান ও গৃহ সম্পূর্ণ ভাবে লুণ্ঠিত হয়। বর্বরদের হাত হইতে হিন্দু-মুসলমান এমনকি শ্বেতাঙ্গ মিশনারী মহিলারাও রেহাই পায় নাই। মাদার সুপিরিয়ার গুরুতর ভাবে আহত হন—তাঁহার সহকর্মিণী তিন জনই নিহত হন; মিঃ ও মিসেস ডাইক্‌স-এর তরুণী কন্যাও শত শত হিন্দু মুসলমান নারী সহ অপহৃতা হয়। বহু হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করা হয়,

বহু হিন্দু নিহত হয়। মুসলমানও রেহাই পায় নাই। মকবুল শিরোয়াণীকে বারমুলার রাজপথে পোষ্টে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রকাশ্যে হত্যা করিয়া তাহার ললাটে নোটিশ মারিয়া দেওয়া হয়—'দেশদ্রোহীর সাজা।'—তখনকার এক বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ : ১৪ হইতে ৩০ বৎসরের নারী ও পুরুষকে পাহাড়ের এক নির্জন কারাগারে লইয়া গিয়া প্রত্যেকটি তরুণীকেই ধর্ষণ করা হয়। বর্বর লুঠেরারা পরে গুপ্ত অর্থের খবর বাহির করিবার জন্য নারী ও পুরুষদের উলঙ্গ করিয়া জলে বসাইয়া রাখে; এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার চলে তিন দিন তিন রাত্রি। ১৩ দিন পরে ভারতীয় সৈন্য বারমুলায় পৌঁছাইয়া হানাদারদের বিতাড়িত করে—বারমুলা উদ্ধার পায়। বারমুলার শহীদ শিরোয়াণী কেন মৃত্যু বরণ করেন, সেই সম্পর্কে তাঁহারই অমর উক্তি :—

'To save my Hindu, Sikh and Muslim sisters from the brutal hands of the raiders, I sacrifice myself.'

যে বর্বর আক্রমণ দেখা গিয়াছে বারমুলায় তেমনি অত্যাচার ও ধ্বংসলীলা চলিয়াছিল মুজাঃফরাবাদ পুঞ্চ রাজৌরী নৌসেরা প্রভৃতি সহরে।

* * *

রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের নিকট ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭, ভারত এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করে যে, পাকিস্তান ভারতের অংশ কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে, বহু অঞ্চল জবরদখল করিয়াছে, ইহার সম্যক্ প্রতিকার করা হউক।—পাকিস্তানী আক্রমণের ১৪ মাস পরে ইউএন-এর মধ্যস্থতায় 'যুদ্ধ-বিরতি' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, এই মাত্র। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ভারত অভিযোগ লইয়া রাষ্ট্রপুঞ্জে গিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। কতিপয় সদস্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতলব ও আদর্শহীনতার দরুণ ভারতের যাহা ছিল প্রধান অভিযোগ,—পাকিস্তানের পররাষ্ট্র আক্রমণ,—তাহাই হইল উপেক্ষিত, আর যাহা রাষ্ট্রপুঞ্জের বিচার্যই নহে, তাহাই (প্লেবিসাইট) যেন একমাত্র বিচার্য। গণ-

ভোটের যে-কথা ভারত বলিয়াছিল তাহা কাশ্মীরবাসীদের জন্য। কাশ্মীরের লোক সাধারণ নির্বাচনে, গণপরিষদে তাহাদের অভিমত চূড়ান্ত ভাবেই প্রকাশ করিয়াছে। ইউএন-এর বিবিধ প্রস্তাব, বিভিন্ন কমিশন এ যাবৎও একটা অবাস্তব ভ্রান্ত পথে নিন্দিত রাজনৈতিক খেলাই খেলিতেছেন। ফলে দীর্ঘ ১২ বৎসর পরেও কাশ্মীর সমস্যা যথাপূর্বই রহিয়া গিয়াছে। আজও যে পাকিস্তান পররাষ্ট্রের অংশ জবর-দখল করিয়া বহাল তবিয়তে থাকিতে পারিতেছে, রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতা ও চারিত্রিক ভ্রষ্টতার ইহাও এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আক্রমণকারীর বিচার হইল না; আক্রান্ত ও আক্রমণকারীকে সমস্তরে নামানো হইল।—ভারত আক্রান্ত কাশ্মীরের অনেকটা অংশ উদ্ধারে সমর্থ হইলেও 'যুদ্ধ-বিরতির' কল্যাণে পাকিস্তান এখনো কাশ্মীরের ⅓ অংশ দখল করিয়া আছে। তাই স্বতঃই মনে হয়, বিচারপ্রার্থী হইয়া শান্তিকামী ভারত সেদিন নিরাপত্তা পরিষদে গিয়া ভুলই করিয়াছে। ভারতের অন্তর্ভুক্তির পরে বিদেশী আক্রমণ-কারীদের সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর হইতে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিয়া দিলেই (অবশ্য তাহা করিতে গিয়া ভারতীয় বাহিনীকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরস্থ ঘাঁটি আক্রমণ করিতে হইত, সেই অধিকারও ভারতের ছিল) সামরিক দিক হইতে সঙ্গত কার্য হইত। যুদ্ধবিরতি রেখার ও-পারের কাশ্মীরের অংশ পাকিস্তানের দখলে। সুদীর্ঘ সীমারেখায় দাঁড়াইয়া আছে ২ হাজার ফুট হইতে ১৩।১৪ হাজার ফুট পর্বতমালা। তবে ইহাও উল্লেখ করা চলে, কাশ্মীরের যে সৌন্দর্য শোভা দেখিতে পৃথিবীর লোক কাশ্মীরে আসে, সে সমস্ত উল্লেখযোগ্য স্থান হইতে পাকবাহিনী সম্পূর্ণ বিতাড়িত। পাকিস্তান কাশ্মীর ছাড়ুক, কাশ্মীরবাসীর বর্তমানে ইহাই একমাত্র দাবী।